জামায়াতে ইসলামীর

কার্যবিবরণী

প্রথম খণ্ড

জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী

প্রথম খণ্ড

জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী

প্রথম খণ্ড

(মূল কার্যবিবরণীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সংকলন)

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশক	ঃ	আবু তাহের মুহাম্মাদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯
১৫তম মুদ্রণ	ঃ	সেপ্টেম্বর - ২০১৩ ভাদ্র - ১৪২০ শাওয়াল - ১৪৩৪
নির্ধারিত মূল্য	ঃ	৪৫.০০ (পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।
কম্পোজ ও মুদ্রণে	ঃ	আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

দু'টি কথা

জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী বিপ্লবী সংগঠন, একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। অবিভক্ত ভারতে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হওয়ার পর দেশ দু'দফা বিভক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তান-ভারত এবং পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দেশে দেশে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামের দাওয়াত ও সংগঠনের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে জামায়াত কাজ শুরু করেছে এই উপমহাদেশে বিগত ১৯৪১ সাল থেকে। আজ জামায়াতের হাজার হাজার কর্মী ও সমর্থক ছড়িয়ে রয়েছে দেশের আনাচে-কানাচে। এদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী কবে, কোথায়, কিভাবে গঠিত হয়েছিল তার ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ।

"জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী" নামে পূর্বে এ গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে উক্ত দুই খণ্ড একত্রে এক খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ খণ্ডে ১৯৪১ সালের প্রথম সম্মেলন হতে ১৯৪৪ সালের দারুল ইসলাম পাঠানকোট সম্মেলন পর্যন্ত কার্যবিবরণীর সন্নিবেশ করা হলো। বর্তমানে এক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি পুনঃমুদ্রণ করে পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ পাকের শোকরিয়া আদায় করছি।

– প্রকাশক

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা
প্রথম সম্মেলন	ঃ	১৩৬০ হিজরী	৯
	ঃ	১৯৪১ ঈসায়ী	
মজলিসে শূরা	ঃ	১৩৬১ হিজরী	৪৩
	ঃ	১৯৪২ ঈসায়ী	
দ্বারভাঙ্গা সম্মেলন	ঃ	১৩৬২ হিজরী	৬২
	ঃ	১৯৪৩ ঈসায়ী	
দারুল ইসলাম সম্মেলন	ঃ	১৩৬৩ হিজরী	৮৩
	ঃ	১৯৪৪ ঈসায়ী	

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম সম্মেলনের কার্যবিবরণী

'মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাখ্যা করে এই সঙ্গে এ জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রস্তাবিত দল গঠনের জন্য একটি নক্শাও পেশ করা হয়েছিল। অতঃপর ১৩৬০ হিজরীর সফর মাসে (১৯৪১ ইং ফেব্রুয়ারী) মাসিক 'তারজুমানুল কুরআন' মারফত সাধারণ মুসলমানদের কাছে এ মর্মে আবেদন জানানো হলো যে, যারা এ আদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং এ মোতাবিক কাজ করতে চান, তারা 'তারজুমানুল কুরআন' অফিসে পত্র লিখুন। পত্রিকা বেরোবার কয়েক দিনের মধ্যেই সংবাদ আসা শুরু হয়ে গেলো। জানা গেলো, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছেন, যারা 'জামায়াতে ইসলামী' গঠন করতে চান এবং এ জন্য কাজ করতেও প্রস্তুত রয়েছেন। অতঃপর ফায়সালা হলো, এদের সবাইকে একত্র করে একটি দল গঠন করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের পাঠানকোটের অন্তর্গত 'দারুল ইসলামে'র মাসিক তারজুমানুল কুরআন অফিসে ১৩৬০ হিজরীর ১লা শাবান (১৯৪১ ইং, ২৫ আগস্ট) এক সম্মেলন আহূত হলো। যারা জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের সবাইকে নির্দেশ দেয়া হলো, যেখানে প্রাথমিক জামায়াত গঠিত হয়ে গেছে, সেখান থেকে শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই আসবেন আর যেখানে এখনো জামায়াতের কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে, সেখান থেকে প্রত্যেকেই যথাসম্ভব আসার চেষ্টা করবেন।

২৮ শে রজব থেকে লোক আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ১লা শাবান পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি হাযির হলেন। অন্যান্য কয়েকজন পরে এলেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মোট সংখ্যা হলো ৭৫ জন।

কতিপয় প্রতিনিধির আগমন প্রতীক্ষায় এবং আরো কয়েকটি কারণে ১লা শাবান নিয়মিতভাবে সম্মেলন শুরু হতে পারলো না। তবে ছোট ছোট গ্রুপ করে সবাই বসে গিয়ে নিজেদের মধ্যে 'জামায়াত' এবং 'আন্দোলন' সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ আলোচনা জারি রইলো। বিকেলের দিকে বহুক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তারজুমান অফিসের বারান্দায় বসে রইলেন। তাদের মধ্যে

প্রায় প্রত্যেকেই মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। তারা মওলানার কাছে বিভিন্ন জটিল ব্যাপার উত্থাপন করতেন এবং মওলানা সেগুলো সমাধান করে দিতেন। ই'শার পর আলোচনা শেষ করে সবাই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

২রা শাবান সকাল ৮টায় তারজুমান অফিসের বারান্দায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সবাই নীচে চাদরের উপর স্থান গ্রহণ করেন শুধু মওলানা মওদূদী প্রয়োজনের খাতিরে সবার অনুমতিক্রমে চেয়ারে বসেন। সভার আসল কাজ শুরু হবার আগে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘ ভাষণ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেনঃ

এমন একদিন ছিল যখন আমিও একজন বংশানুক্রমিক মুসলমান ছিলাম এবং এভাবেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর যখন জ্ঞান হলো, আমি অনুভব করলাম, এভাবে নিছক مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا - আমার বাপ-দাদা যে পথে চলেছে আমিও সেই পথের অনুসারী'- এ নীতি মেনে চলার কোন অর্থ নেই। অবশেষে আমি আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। আমি ইসলামকে বুঝলাম এবং জেনে-বুঝে এর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর ধীরে ধীরে ইসলামকে সামগ্রিক ও বিস্তারিতভাবে বুঝবার এবং জানবার চেষ্টা করলাম। এ ব্যাপারে আমি যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলাম, তখন যে সত্যের উপর নিজে ঈমান এনেছিলাম তার দিকে সবাইকে আহ্বান করতে লাগলাম।

এ উদ্দেশ্যে ১৩৫২ হিজরীতে (ভারতের হায়দরাবাদ থেকে) মাসিক 'তারজুমানুল কুরআন' পত্রিকা প্রকাশ করলাম। প্রথম কয়েক বছর কেটে গেছে বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের আলোচনা এবং দীনের একটি স্পষ্ট ধারণা পেশ করার মধ্য দিয়ে। এরপর শুরু করলাম দীনকে একটি আন্দোলন হিসেবে পেশ করার কাজ। আমাদের জীবনে দীনদারী যাতে করে শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত কর্মানুশীলনের রূপ নিয়ে নিষ্ক্রিয়তায় এবং স্ববিরত্বে না পৌছুয়, বরং সমষ্টিগতভাবে আমরা যাতে করে দীনের ব্যবস্থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে জারি এবং কার্যকর করতে এবং বিরোধী ও প্রতিবন্ধক শক্তিসমূহকে এর পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি— দীনকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করার পেছনে এই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ সিলসিলার প্রথম পদক্ষেপ হলো 'দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠান' কায়েম। ১৩৫৭ হিজরীতে (১৯৩৮ ইং) এ পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

সে সময় আমার সহযোগী ছিলেন মাত্র চারজন। এ ছোট কাফেলাটিকে তখন নিতান্ত তুচ্ছ মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা কখনো

ঘাবড়ে যাইনি। ইসলামী আন্দোলনের দিকে আমরা লোকদেরকে অনবরত দাওয়াত দিতে লাগলাম এবং মানুষের চিন্তাজগতকে এই আন্দোলনের উপযোগী করার জন্য প্রচেষ্টা জারি রাখলাম। ইত্যবসরে এক একজন করে সহযোগীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই একই চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের বেশ দু'একটি ছোট গ্রুপ গড়ে উঠতে লাগলো। ইসলামী আন্দোলনের বইপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মৌখিক দাওয়াত ও প্রচারের কাজও বেড়ে গেল। অতঃপর আন্দোলনের প্রভাব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার পর অনুভূত হলো যে, বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী গঠন এবং ইসলামকে সুসংগঠিত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং এ সময় দ্বিতীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

কাজেই এরই ভিত্তিতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ঐতিহাসিক মন্তব্যের পর মওলানা মওদূদী বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত যেসব আন্দোলন জন্ম নিয়েছে এবং যেগুলো বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে প্রথমে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের এ আন্দোলনের নীতিগত পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে ঃ

প্রথমত, সেগুলোর মধ্যে ইসলামের কোনো অংশ বিশেষকে অথবা দুনিয়ার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্য থেকে কোন একটি উদ্দেশ্যকে আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সত্যিকার এবং আসল ইসলামকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। সমগ্র এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামটাই আমাদের আন্দোলন।

দ্বিতীয়ত, সেগুলোর দলীয় সংগঠন হয়েছে দুনিয়ার বিভিন্ন সংঘ, সমিতি এবং প্যার্টির রীতি অনুযায়ী। কিন্তু আমরা অবিকল সেই জামায়াতী ব্যবস্থা গ্রহণ করছি যা প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের ছিল।

তৃতীয়ত, সেখানে বিনা দ্বিধায় সব রকমের লোককে ভর্তি করে নেয়া হয়েছে। মুসলমান বাপ-দাদার ঘরে পয়দা হয়েছে কাজেই এরা (মুসলমানই) হবে, এ ধারণাই সেখানে কার্যকর হয়েছে এবং এর ফল হয়েছে এই যে, আরকান (সদস্য) থেকে নিয়ে সাধারণ কর্মী এবং নেতৃবর্গ পর্যন্ত এমন অনেক লোক সেই সব জামায়াতের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিল না এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা রাখতো না। কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তিকে 'সে মুসলমান' এ ধারণার বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করি না। বরং যখন সে কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ, উদ্দেশ্য এবং তার দাবী হৃদয়ংগম করে তার উপর ঈমান আনার কথা ঘোষণা করে, তখনই তাকে

জামায়াতের মধ্যে শামিল করি এবং তার জামায়াতের মধ্যে প্রবেশ করার পর জামায়াতে অবস্থান করার জন্য এ শর্ত নির্ধারিত করি যে, ইসলামে ঈমানের যে সর্বনিম্ন দাবী তা তাকে পূর্ণ করতে হবে। এভাবে ইনশাআল্লাহর মুসলমান জাতির মধ্য থেকে কেবলমাত্র সত্য-সচেতন ও সৎ ব্যক্তিরাই এ জামায়াতে প্রবেশ করবে এবং যতোই সমাজে সত্য-সচেতনতা এবং সৎপ্রবণতার প্রসার ঘটবে, ততোই সমাজের সৎ ব্যক্তিরা এ জামায়াতে প্রবেশ করতে থাকবে।

চতুর্থত, ঐ আন্দোলনগুলোর দৃষ্টি স্রেফ ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষেও তা শুধু মুসলিম জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেউ কেউ এর চাইতে একটু অগ্রসর হয়ে ভারতের বাইরে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, ঐ আন্দোলন শুধু তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যারা প্রথম থেকেই 'মুসলিম জাতির' অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাদের আগ্রহও শুধু মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যাবলী পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। অমুসলিমদের জন্য আবেদনশীল কোনো জিনিস তাদের কার্যাবলীর মধ্যে ছিল না। বরং তাদের অধিকাংশের কর্মতৎপরতা অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে অগ্রসর হবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পূর্ণ ইসলামটাই যেহেতু আমাদের আন্দোলন এবং ইসলামের দাওয়াত দুনিয়ার সমগ্র মানব সমাজের জন্য, সেহেতু আমাদের দৃষ্টি কোনো বিশেষ জাতি অথবা বিশেষ দেশের সাময়িক সমস্যার জটিল আবর্তে আটকে যায়নি। বরং তা সমগ্র মানব জাতির উপর সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সমগ্র মানব জাতির জীবন সমস্যাই আমাদের জীবন সমস্যা। আল্লাহর কিতাব এবং নবী করীমের স. সুন্নাত থেকে আমরা ঐ জীবন সমস্যার সমাধান পেশ করি। এরি মধ্যে সবার জন্য উপকার, সুবিধা ও সাফল্য রয়েছে।

এভাবে আমাদের জামায়াতে শুধু বংশগত মুসলমানদের মধ্য থেকে সৎ লোকরাই প্রবেশ করবে এমন কথা নয়, অমুসলিমদের মধ্যেও যেসব লোক রয়েছে, তারাও ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে শামিল হতে থাকবে।

অতঃপর মওলানা মওদূদী বলেন, এ বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে রেখেই আমরা আমাদের এ জামায়াতকে 'ইসলামী জামায়াত' এবং এ আন্দোলনকে 'ইসলামী আন্দোলন' বলি। কেননা, ইসলামের যে আকীদা-বিশ্বাস, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, দলীয় সংগঠন এবং কর্মপদ্ধতি হামেশা ছিল, হুবহু সেগুলোই এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই এর জন্য ইসলামী জামায়াত ছাড়া দ্বিতীয় কোন নাম হতেই পারে না এবং ইসলামী লক্ষ্য ও গন্তব্যের দিকে ইসলামের পথ ধরেই এ জামায়াত অগ্রসর হয়, কাজেই এর আন্দোলন ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু নবুওয়াত উত্তরকালে

যখনই দুনিয়ায় এ ধরনের কোনো আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, তখনই সে দুটো ভয়াবহ অভ্যন্তরীণ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

একঃ এ ধরনের জামায়াত গঠন এবং এ ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করার পর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মনে খুব শিগগির এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের যামানায় ইসলামী জামায়াতের যে মর্যাদা ছিল তাদের জামায়াতের মর্যাদাও অনুরূপ।

অন্য কথায়, যে এ জামায়াতের মধ্যে শামিল হয়নি, সে মু'মিন নয় এবং مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ - 'যে দলত্যাগী হলো সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।' এর ফলে এ জামায়াতটি অতি অল্পকালের মধ্যে মুসলমানদের একটি ফেরকায় পরিণত হয়। অতঃপর এর সম্পূর্ণ সময় আসল কাজের পরিবর্তে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে বিবাদ এবং বিতর্কের পেছনে নিঃশেষ হয়ে যায়।

দুইঃ এ ধরনের জামায়াতগুলো যাকে নিজেদের ইমাম অথবা আমীর বলে স্বীকার করে নেয়, তার সম্পর্কে তাদের মধ্যে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তার মর্যাদা নবী করীমের স. পর খোলাফায়ে রাশেদার মর্যাদার সমান। অর্থাৎ ঐ ইমামের হাতে যে 'বাইয়াত' হয়নি, সে মুসলমান নয়। এ ভুল ধারণার ফল এই দাঁড়ায় যে, নিজেদের আমীর অথবা ইমামের 'ইমারতি' এবং 'ইমামত' স্বীকার করাবার মধ্যে তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা সীমিত হয়ে যায়।

মওলানা মওদূদী বলেন, এ দুটো বিপদ থেকে গা বাঁচিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে। জেনে রাখুন, প্রাথমিক পর্যায়ে নবী করীমের নেতৃত্বে যে জামায়াত পরিচালিত হয়েছিল, আমরা ঠিক সে পর্যায়ের নই। বরং আসল জামায়াতী ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবার পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে জামায়াত প্রচেষ্টা চালায় আমাদের অবস্থা ঠিক তারই সমপর্যায়ের। নবীর নেতৃত্বে যে জামায়াত গঠিত হয়, সমগ্র দুনিয়ায় তা হয় একটি মাত্র ইসলামী জামায়াত এবং তার চতুঃসীমার বাইরে একমাত্র কুফরেরই অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ ব্যবস্থা এবং কার্যধারার পুনরুজ্জীবনের সংকল্প নিয়ে যে সমস্ত লোক আন্দোলন পরিচালনা করবেন, তারা সবাই যে একটি মাত্র দলভুক্ত হবেন, এমন কোনো কথা নেই।

একই সময়ে এ ধরনের জামায়াত একাধিকও হতে পারে এবং তাদের মধ্য থেকে কারোর একথা বলার অধিকার নেই যে, আমাদের জামায়াতটাই একমাত্র ইসলামী জামায়াত এবং আমাদের আমীরই হলেন আমীরুল মু'মিনীন। এ ব্যাপারে জামায়াতে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সংযত হতে হবে এবং বাড়াবাড়ি

থেকে নিজেকে কঠোরভাবে রক্ষা করতে হবে। কেননা বলা বাহুল্য মুসলমানদের একটি ফেরকায় পরিণত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ্‌র দীনের জন্য কিছু কাজ করার পরিবর্তে তার মধ্যে নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কারণ আমরা যেন না হই, এ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অতঃপর মওলানা মওদূদী বলেন, দুনিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর কর্তব্য সম্পর্কে কোনো সংকীর্ণ ধারণা নিজেদের মধ্যে স্থান দেবেন না। আসলে এর কাজের ক্ষেত্র শুধু একটি নয় বরং সমগ্র মানব জীবন তার সমগ্র ব্যাপকতা নিয়ে এর কাজের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং মানুষের সঙ্গে যে জিনিসের কোনো সম্পর্ক আছে, তার সম্পর্ক ইসলামের সঙ্গেও আছে। কাজেই ইসলামী আন্দোলন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলন।

এ ক্ষেত্রে একথা চিন্তা করাই ভুল যে, এখানে কাজ করার জন্য শুধুমাত্র একটি বিশেষ যোগ্যতা এবং একটি বিশেষ মানের পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন। বরং এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির করণীয় রয়েছে। কেউ এখানে বেকার পড়ে থাকবে না। যে ব্যক্তি যে ধরনের যোগ্যতা রাখেন, সেই মোতাবিক তিনি ইসলামের খেদমতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, গ্রামবাসী, নগরবাসী, কৃষক-মজুর, ব্যবসায়ী, চাকুরে, বক্তা, নকলনবীস, সাহিত্যিক, অশিক্ষিত আর মহাজ্ঞানী-মহাপন্ডিত সবাই এখানে একইভাবে কাজ করে যেতে পারেন এবং এখানে সবারই প্রয়োজন। তবে এখানে শর্ত হলো মাত্র একটি এবং তা এই যে, তাদেরকে জেনে-বুঝে ইসলামী আকীদাকে গ্রহণ করতে হবে, সেই মোতাবেক কাজ করার ফায়সালা করতে হবে এবং যে উদ্দেশ্য পূর্ণ করাকে ইসলাম মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছে তাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে পরিণত করে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

অবশ্য জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে একথা ভালভাবেই জেনে রাখা দরকার যে, জামায়াতের সামনে যেসব কাজ রয়েছে তা মোটেই সহজ এবং সামান্য নয়। দুনিয়ার সমস্ত জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে দুনিয়ার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি, নৈতিকতা সবকিছুই পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহ্-বিরোধিতার উপর দুনিয়ার যে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকে পরিবর্তিন করে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং এ কাজে সকল শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে তাকে জিহাদ করতে হবে।

এ দায়িত্বকে সহজ এবং সামান্য মনে করে যদি কেউ অগ্রসর হয়, তাহলে সম্মুখে বাধা-বিপত্তির উত্তুঙ্গ পাহাড় অবলোকন করে অতি শীঘ্রই সে হিম্মতহারা হয়ে

পড়বে। এ জন্য এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামনে এক কদম অগ্রসর হবার আগে সে কি রকম কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হচ্ছে তা জেনে রাখা উচিত। এ পথে সামনে অগ্রসর হওয়া এবং পেছনে সরে আসা সমান কথা নয়। এখানে পেছনে সরে আসার অর্থ হলো মুরতাদ হওয়া। একথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এ জামায়াত পরিত্যাগ করা মুরতাদ হবার নামান্তর। বরং এর আসল অর্থ হলো আল্লাহর পথে অগ্রসর হবার পর বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ এবং ক্ষয়-ক্ষতি প্রত্যক্ষ করে পেছনে সরে আসা এর আসল উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্যের দিক দিয়ে মুরতাদ হবার নামান্তর।

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْمُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْبَاءَبِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

'সেদিন যে তাদের থেকে পেছনে সরে আসবে— তবে যে লড়াই করার জন্য অথবা অন্য দলে স্থান গ্রহণ করার জন্য পেছনে সরে আসবে সে ছাড়া— সে আল্লাহর গযবের মুখোমুখি হয়েছে, তার স্থান জাহান্নামে এবং ফিরে যাবার জন্য সেটি খুব খারাপ জায়গা।'

কাজেই সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে ভালো করে চিন্তা করে নিন। এমন দৃঢ় মনোবল নিয়ে আপনাকে অগ্রসর হতে হবে যে, যে পা একবার সামনে অগ্রসর হবে, তা আর পেছনে হটবে না। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এ ব্যাপারে সামান্যতম দুর্বলতা অনুভব করছে, তার জন্য এ মুহূর্তেই থেমে যাওয়া বেহতের।

অবশেষে মওলানা মওদূদী বলেন, যেসব লোক জেনে-বুঝে ইসলামী আকীদা গ্রহণ করেছেন এবং তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য কাজ করতেও প্রস্তুত, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত পার্থক্য খতম করে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী এক জামায়াতভুক্ত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দলীয় পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য একটি ব্যবস্থা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন, এটি হলো এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আপনাদের জন্য একটি দল গঠন করে দেবার পর আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমি ছিলাম নিছক একজন আহ্বায়ক। আমি আপনাদের বিস্মৃত কাজ স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। এ ধরনের একটি জামায়াত গঠন করাই আমার সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য। জামায়াত গঠিত হবার পর এখন আমি আপনাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি মাত্র। এখন নিজেদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিকে আমীর নির্বাচন করার দায়িত্ব জামায়াতের উপর অর্পিত হয়েছে। অতঃপর ঐ আমীর ভবিষ্যতে এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিজের বিবেকসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে কার্যকর করবেন।

আমার সম্পর্কে কারোর মনে যেন এ ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, যেহেতু আমিই সবাইকে দাওয়াত দিয়েছি, সেহেতু ভবিষ্যতে এ আন্দোলনের নেতৃত্বদান করাকে আমি নিজের অধিকার মনে করতে পারি। না, কখনো নয়। আমি নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা রাখি না এবং আহ্বায়ককে শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বও দিতে হবে, এ নীতির সমর্থকও আমি নই। এ বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা আমার আছে এ ধারণাও করতে পারি না। এ কাজের বিপুল দায়িত্ব প্রত্যক্ষ করে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেবার বাসনা পোষণ করতে পারেন না। এর চাইতে নির্বুদ্ধিতা আর নেই।

আসলে আমার আকাঙ্খা যদি কিছু থাকে, তাহলে তা হলো শুধু এতটুকু যে, নির্ভুল ইসলামী ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি জামায়াত গঠিত হবে এবং আমি তার মধ্যে শামিল হবো। কোনো অনৈসলামী ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট অথবা উযিরে আযমের পদ গ্রহণ করার চাইতে ইসলামী ব্যবস্থার ভিত্তিতে গঠিত কোনো জামায়াতের অধীনে একজন চাপরাশির কাজ করাও আমার নিকট অধিকতর গর্বের বস্তু। কাজেই এ ধারণাকে মোটেই আমল দেবেন না যে, জামায়াত গঠনের আগে যেমন আমি নিজের দায়িত্বে সমস্ত কাজ চালিয়েছি, তেমনি জামায়াত গঠনের পরও আমি নিজেই আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। জামায়াত গঠিত হবার পর আমার এতদিনকার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের কাজের যাবতীয় দায়িত্ব জামায়াতের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। জামায়াত নিজের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব যার উপর সোপর্দ করবে তার আনুগত্য, কল্যাণ কামনা এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করা জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় আমার উপরও ফরয।

সম্মেলনের সূচনায় এ বক্তৃতা প্রদান করার পর তিনি জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের খসড়া পাঠ করতে লাগলেন। খসড়া গঠনতন্ত্রের কয়েক কপি প্রথমেই ছাপিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করার জন্য সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবর্গকে দু'একদিন পূর্বে তা সরবরাহ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধারণ সভায় পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়। এর প্রত্যেকটি শব্দ পঠিত হয় অতঃপর তার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে এ সভা শেষ হয়। মাঝখানে শুধু দুপুরে খাবার এবং যোহর ও আসরের নামাযের জন্য সভা মুলতবী করা হয়। যাহোক সন্ধ্যার পূর্বেই প্রায় সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে যায়। কতিপয় সংশোধন ও সংযোজনসহ সমগ্র গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর সর্বাগ্রে মওলানা মওদূদী উঠে কালেমায়ে শাহাদত– 'আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ

ওয়া রাসূলুহু' পড়লেন। তিনি বললেনঃ ভাইগণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আজ নতুন করে ঈমান আনলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে শামিল হলাম। তারপর মওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী উঠে নতুন করে ঈমান আনার স্বীকৃতি দিলেন। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই একজনের পর একজন করে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করলেন এবং জামায়াতের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন।

এ সময় অধিকাংশ লোকের চোখ অশ্রু সজল ছিল, অনেকের কাঁদতে কাঁদতে বেহাল অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করার সময় প্রায় প্রত্যেকেই বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করে কেঁপে উঠেছিলেন। সবাইর কালেমায়ে শাহাদাতের অংগীকার শেষ হবার পর মওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়ে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন ঃ আসুন, আমরা সবাই মিলে রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করি, যেন তিনি আমাদের জামায়াতকে স্থায়িত্ব এবং অবিচল থাকার শক্তি দান করেন এবং আমাদেরকে তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের উপর চলার সুযোগ দান করেন।

দোয়া করার পূর্বে মওলানা মওদূদী ইসলামী জামায়াতের মর্যাদা, তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের উপর পুনর্বার আলোকপাত করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জানালেন যে, তারা আজ কত বড় শপথ করেছেন এবং একে কিভাবে কার্যকর করতে হবে। অতঃপর মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী দোয়া শুরু করলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সবাই কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলেন। অবেশেষে মওলানা মওদূদী একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া পড়ার পর সভার কার্য শেষ হলো।

৩রা শাবান- সকাল ৮টায় আবার অধিবেশন শুরু হলো। সর্বপ্রথম মওলানা মওদূদী জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যকে পৃথক পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি জামায়াতের কোন্ শ্রেণীর জন্য নিজেকে পেশ করতে পারেন। শ্রেণীগতভাবে জামায়াত সদস্যগণের তালিকা প্রস্তুত হয়ে যাবার পর মওলানা মওদূদী বক্তৃতা করার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করে বললেন যে, একই বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্ম-পদ্ধতির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্য একই দলভুক্ত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বাভাবিকভাবেই তারা একটি দল গঠন করে। কালেমার ঐক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো পারস্পরিক ঐক্য ও একই দলভুক্তি। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন একমাত্র, সেখানেই, যেখানে কালেমা বিভিন্ন। কালেমার ঐক্য সত্ত্বেও স্বার্থপরতার ভিত্তিতে যে বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব হয়, তারও আসল কারণ হলো এই যে, স্বার্থপরতা নিজেই একটি কালেমা এবং এটি ইসলামের কালেমার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এ কালেমার আনুগত্যকারী অন্যান্য

সকল ব্যাপারে অন্যের সঙ্গে একমত হওয়া সত্ত্বেও নিজের পথ পৃথক করে নেয়।

কাজেই যখন আপনারা সাক্ষ্য দিলেন যে, আপনারা সবাই একই আকীদা-বিশ্বাস, একই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কর্মপদ্ধতির অধিকারী অর্থাৎ আপনারা সবাই একই কালেমার অনুগত, তখন আপনারা স্বাভাবিকভাবে একই দলবদ্ধ হয়ে গেলেন। আপনাদের অথবা আমার মধ্যে মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথের দিকে আহ্বানকারী স্বার্থপরতার অনুপ্রবেশ থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। এখন আপনাদের জামায়াতী জীবন শুরু হচ্ছে। জামায়াত বা সংগঠনের পথে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আগে ইসলামে জামায়াতী জীবনের বিধি-বিধান সম্পর্কে আপনাদেরকে ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো।

প্রথম কথা হলো ঃ জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমষ্টিগতভাবে জামায়াতী ব্যবস্থার এবং ব্যক্তিগতভাবে জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার সঙ্গে মঙ্গলাকাংখী হওয়া উচিত। জামায়াতের অমঙ্গলাকাংখা অথবা জামায়াতের ব্যক্তিবর্গের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, কুধারণা পোষণ এবং তাদের ক্ষতিসাধন ও কষ্ট প্রদান-এসব এমন ঘৃণ্য অপরাধ যে, এগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঈমান বিরোধী গণ্য করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলোঃ আপনাদের এ জামায়াতটি ঐ দলগুলোর মতো নয়, যারা প্রায়ই 'আমার দল-ন্যায় অথবা অন্যায় যাই করুক না কেন বলে চিৎকার দিয়ে থাকে'। আসলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সম্পর্কই আপনাদের পরস্পরকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। আর আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রথম দাবী হলো এই যে, আপনার বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ঘৃণা সবকিছুই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কারণেই। ভালোবাসা, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আপনাদের পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে, আল্লাহ-বিরোধিতার ব্যাপারে নয়।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

আল্লাহর পক্ষ থেকে জামায়াতের কল্যাণ কামনার যে দায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পিত হয়েছে, তার অর্থ শুধু বাইরের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা নয়। ভেতরের ব্যাধি-যা জামায়াতের সংগঠনকে নষ্ট করে দিতে পারে, তা থেকে তাকে মুক্ত রাখার জন্যও সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। জামায়াতের সবচাইতে বড় কল্যাণ কামনা হলো, তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়া।

তার মধ্যে ভ্রান্ত উদ্দেশ্য, ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত পদ্ধতির সম্প্রসারণের গতি রোধ করা। তার মধ্যে স্বার্থভিত্তিক দলাদলি সৃষ্টির সুযোগ না দেয়া। তার মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ করা। তার মধ্যে কোনো পার্থিব স্বার্থ অথবা কোনো ব্যক্তি পূজার সুযোগ সৃষ্টি না করা এবং তার গঠনতন্ত্রকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা।

অনুরূপভাবে জামায়াতের সহযোগীদের কল্যাণ কামনার যে দায়িত্ব প্রত্যেকের উপর অর্পিত হয়েছে, তার অর্থ কখনোই এ নয় যে, আপনি নিজের জামায়াতের লোকদেরকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করবেন এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা করে যাবেন। বরং এর অর্থ হলো এই যে, সৎকাজে আপনি তাদের সহযোগিতা করবেন এবং অসৎ কাজে শুধু তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেই ক্ষান্ত থাকবেন না বরং তাদের সংস্কার করার জন্য কার্যকর প্রচেষ্টা চালাবেন।

একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের সবচাইতে বড় যে কল্যাণ সাধন করতে পারে, তা হলো এই যে, তাকে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত দেখলে সঙ্গে সঙ্গেই সোজা করে দেবে এবং তাকে নিজের উপর অত্যাচার করতে দেখলে তার হাত ধরে ফেলবে। অবশ্য পারস্পরিক সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে নজর রাখতে হবে যেন উপদেশ প্রদানের ব্যাপারে দোষ-উন্মোচন, দূরবীন লাগিয়ে তুচ্ছতম দোষটিও খুঁজে বের করা এবং এর উপর কঠোরভাবে হামলা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা না হয়। বরং বন্ধুত্ব, দরদ, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। আপনি যার সংস্কার সাধন করতে চান, সে যেন আপনার কার্যধারা দেখে অনুভব করতে পারে যে, তার নৈতিক রুগ্নতা আপনার অন্তরকে ব্যথিত করেছে– এমন নয় যে, তাকে নিজের থেকে নিম্নতম পর্যায়ের জীব বিবেচনা করে আপনার অহঙ্কারী মন-আত্ম-সুখ অনুভব করছে।

তৃতীয় কথা, যেদিকে আমি এইমাত্র ইংগিত করেছি, কিন্তু এর অত্যধিক গুরুত্বের ফলে একে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কথাটি হলো এই যে, জামায়াতের মধ্যে জামায়াত গঠনের চেষ্টা করা কখনো উচিত নয়। ষড়যন্ত্র, গ্রুপিং, ভেতরে ভেতরে প্রচারণা চালানো (Canvassing), পদপ্রার্থী হওয়া, জাহেলী প্রবণতা এবং স্বার্থবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা- এসব জিনিস এমনিতেই জামায়াতী জীবনধারার জন্য ভীষণ বিপজ্জনক। অধিকন্তু ইসলামী জামায়াতের সংগঠন এবং প্রাণশক্তির সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই। অনুরূপভাবে পরনিন্দা, নামের বিকৃতি এবং কু-ধারণাও জামায়াতী জীবনধারার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

চতুর্থ কথা হলো এই যে, পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করাই জামায়াতী জীবনের প্রাণশক্তি। একে কখনো এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তির উপর জামায়াতী কাজের কোনো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাকে অবশ্য নিজের কাজের ব্যাপারে অন্যান্য সহযোগীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অন্যদিকে যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে অবশ্য সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিজের আসল মতকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে হবে। যে ব্যক্তি সামষ্টিক পরামর্শের ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মোতাবিক রায় দান করতে বিরত থাকে, সে জামায়াতের উপর জুলুম করে এবং যে কোন বিশেষ কারণে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার বিপক্ষে রায় দান করে, সে জামায়াতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং যে পরামর্শের সময় নিজের রায় গোপন করে এবং পরে তার উদ্দেশ্য বিরোধী কোনো ফয়সালা হয়ে গেলে জামায়াতের মধ্যে সংশয় সৃষ্টিতে তৎপর হয়, সে জঘন্যতম আত্মসাৎ করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়।

পঞ্চম কথা হলো এই যে, দলীয় পরামর্শের ব্যাপারে কাউকে নিজের মতের উপর এত বেশি জোর দেয়া উচিত নয় যে, তার কথা স্বীকৃত না হলে সে জামায়াতের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না অথবা অধিকাংশের ফয়সালার বিরুদ্ধে কাজ করবে। অনেক নাদান আছেন, অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে এটিকে তারা হকপরস্তি মনে করে থাকেন। অথচ এটি স্পষ্টত ইসলামী বিধি-বিধান এবং সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত কার্যক্রম বিরোধী।

কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা এবং স্পষ্ট বিধান থেকে কোনো নির্দেশ বের করার অথবা সে বিষয়টি কোনো পার্থিব কর্মকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন, উভয় অবস্থায়ই সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি এই ছিল যে, যতক্ষণ কোনো বিষয়ের আলোচনা হতো, ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান মোতাবিক স্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করতেন। কিন্তু কারোর মতের বিপক্ষে ফয়সালা হয়ে গেলে তিনি নিজের মত প্রত্যাহার করতেন অথবা নিজের মতকে নির্ভুল জানা সত্ত্বেও উন্মুক্ত হৃদয়ে জামায়াতের সহযোগী হতেন। দলীয় জীবনের জন্য এ পদ্ধতিটি অপরিহার্য। নইলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, যেখানে একজন লোক নিজের মতকে অত্যধিক দৃঢ়ভাবে সমর্থন করতে গিয়ে দলীয় ফয়সালাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সেখানে সমগ্র দলীয় ব্যবস্থা অবশেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হবে।

সর্বশেষ এবং জামায়াতী জীবনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে, "ইসলাম জামায়াত ছাড়া নয় এবং জামায়াত ইমামত ছাড়া নয়"– এই সাধারণ নিয়মানুযায়ী জামায়াত গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের নিজেদের জন্য একজন

আমীর নির্বাচন করতে হবে। আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে যেসব বিষয় আপনাদেরকে সামনে রাখতে হবে– তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি আমীর পদপ্রার্থী হবে, তাকে যেন কখনোই নির্বাচন করা না হয়। কেননা এ বিরাট কাজের দায়িত্ববোধ যার মধ্যে থাকবে, সে কখনো নিজে এ বোঝাকে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করবে না এবং যে এ ইচ্ছা প্রকাশ করবে, সে আসলে দায়িত্ব পালনেচ্ছু নয়, কর্তৃত্বাভিলাষী হবে। এ জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে কখনো তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে না। নির্বাচনের ব্যাপারে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মানুষ পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করতে পারে। কিন্তু কারোর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে গোপন কানাকানি এবং প্রচেষ্টা চালানো যাবে না। ব্যক্তি-সমর্থন প্রবণতাকে অন্তর থেকে নির্গত করে দিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন যে, জামায়াতের কোন্ লোকটির তাকওয়া, কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান, দীন সম্পর্কে সুগভীর প্রজ্ঞা, সমস্যা বুঝবার ও সমাধান করার ক্ষমতা এবং আল্লাহ্র পথে অবিচল থাকার উপর আপনি সবচেয়ে বেশি আস্থা স্থাপন করতে পারেন। অতঃপর এ মানদণ্ডে যে লোকটি উৎরোবে আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে তাকেই নির্বাচিত করুন এবং তাকে নির্বাচন করার পর তার কল্যাণ কামনা, তার সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা, ন্যায় কাজের জন্য তার আনুগত্য এবং অন্যায় কাজে তার সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো আপনার কর্তব্য।

এ সঙ্গে একথাও ভালোভাবে বুঝে নিন যে, ইসলামী জামায়াতের আমীরের মর্যাদা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের মর্যাদার অনুরূপ নয়। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়, তার মধ্যে সব রকমের গুণাবলী অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু আমানতদারী এবং আল্লাহভীতির গুণে তিনি গুণান্বিত কিনা সেদিকে একটুও দৃষ্টি দেয়া হয় না। বরং সেখানকার নির্বাচন পদ্ধতিই এমন ছাঁচের, যার ফলে যে সবচাইতে বেশি ধুরন্ধর, প্রতারক, কূটকৌশলী, ষড়যন্ত্র বিশারদ এবং বৈধ-অবৈধ সব করমের উপায়-উপকরণের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে অভ্যস্ত, সেই-ই কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়।

এ জন্য স্বভাবতই তারা নিজেদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের উপর নির্ভর করতে পারে না। তারা সর্বদা তার বেঈমানীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে এবং এ জন্য গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন রকমের বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে তার সীমাতিরিক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ এবং স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হবার পথ আটকাবার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে ইসলামী জামায়াতের পদ্ধতি হলো এই যে, সর্বপ্রথম নিজের নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে সে তাকওয়া ও আমানতদারীর অনুসন্ধান করে এবং এ জন্য

নিজের যাবতীয় ব্যাপার পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে তার হাতে সোপর্দ করে। কাজেই পাশ্চাত্য ধরনের গণতান্ত্রিক দলগুলোর অনুসারী হয়ে আপনারা নিজেদের গঠনতন্ত্রে নিজেদের আমীরের উপর সেই সব বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করবেন না, যা সাধারণত সেখানে প্রেসিডেন্টের উপর আরোপ করা হয়। আপনারা যখন কাউকে আল্লাহভীরু ও আমানতদার মনে করে তাকে আমীর নির্বাচিত করেন, তখন তার উপর নির্ভর করুন। আর যদি কারোর আল্লাহভীরুতা ও আমানাতদারী আপনাদের এত বেশি সন্দেহপূর্ণ হয়ে থাকে যে, আপনারা তার উপর নির্ভর করতে পারেন না, তাহলে আদতে তাকে নির্বাচিতই করবেন না।

এই বক্তৃতার পর আমীর নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। আলোচনায় তিনটে ভিন্নমতের উদ্ভব হলো। দুপুর পর্যন্ত এ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রইলো এবং কোন সর্বসম্মত ফয়সালায় পৌঁছানো সম্ভব হলো না।

একটি দলের মতে আপাতত সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে আমীর নির্বাচন করা হোক। কেননা প্রথমত বর্তমানে আমাদের জামায়াতের সদস্য সংখ্যা এত কম যে, এতে নির্বাচনের সংকুলান খুব কমই রয়েছে। যদি বর্তমানে আমরা এই গুটিকয়েক লোকের মধ্য থেকে একজন যোগ্যতর ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে নির্বাচন করে নেই, তাহলে পরবর্তীকালে যখন জামায়াত আরো অগ্রসর হবে এবং আরো অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির সমাগম হবে, তখন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত মুষ্টিমেয় লোকের জামায়াতটি যদি এ মুহূর্তে কোন স্থায়ী আমীর নির্বাচন করে, তাহলে বাইরের যে বিপুল জনসমষ্টি আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত, তারা শুধু এই জন্যই জামায়াতের মধ্যে প্রবেশ করতে ইতস্তত করবে যে, এ জামায়াতের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সেই আমীরকেও মেনে নিতে হবে, যার নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের মতামতের কোন সম্পর্ক ছিল না।

এভাবে আমাদের আমীর নির্বাচনের ব্যাপারটা পরবর্তীকালে জামায়াতের সম্প্রসারণের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং এর ফলে একটি বৃহত্তর জামায়াত গঠনের পরিবর্তে পৃথক পৃথক জামায়াত গঠিত হবে এবং একটির পরিবর্তে বহু আমীরের ঝান্ডা বুলন্দ হবে।

দ্বিতীয় দলের অভিমত ছিল এই যে, বর্তমানে আদতে আমীর নির্বাচনই করা হবে না। বরং কতিপয় লোককে নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করে তার হাতে জামায়াতের সংগঠন এবং পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক এবং এ পরিষদের একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হোক। এ দলের সন্দেহও ছিল প্রথমোক্ত দলের অনুরূপ এবং এ ছাড়াও এদের মতে এখনো এমন কোন মর্দে কামিল দৃষ্টিগোচর হয়নি যার মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামের স্থলাভিষিক্তির যোগ্যতা রয়েছে।

তৃতীয় দলের অভিমত ছিল এই যে, আমীরবিহীন জামায়াত তো একেবারেই অর্থহীন, তবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচনটি হলো একটি অনৈসলামী পদ্ধতি। কুরআন ও সুন্নাহে আমরা এর কোন নজির পাই না। উপরন্তু একদিকে আমরা এমন এক চরম বৈপ্লবিক আদর্শের ধারক, যা দুনিয়ার সমস্ত শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। আর অন্যদিকে আমরা নিজেরাই নিজেদের জামায়াতের ব্যবস্থাকে এতই নরম এবং ঢিলে করে রাখছি যার ফলে কোনো বিরাট প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সে দৃঢ় এবং অবিচল থাকতে পারে না, একথা মোটেই বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। বলা বাহুল্য, আমীরবিহীন অথবা অস্থায়ী আমীর নির্বাচনের ভিত্তিতে যে জামায়াতী ব্যবস্থা গঠিত হবে, তা কখনো শক্তিশালী হবে না। কাজেই এ মুহূর্তেই আমীর নির্বাচন করা উচিত এবং এতে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শর্ত থাকবে না।

কয়েক ঘন্টা আলোচনার পরও যখন এ বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হলো না, তখন অবশেষে যোহরের সময় ফয়সালা করা হলো যে, এ বিষয়টি সাতজনের একটি মজলিসের নিকট সোপর্দ করা হবে এবং ঐ মজলিসের ফয়সালা সবাই মেনে নেবেন। কাজেই তিনটি দলই একযোগে নিম্নলিখিত সাতজনকে নির্বাচিত করলেন ঃ

১। মুহাম্মদ মনযুর নোমানী-সম্পাদক, 'আল-ফুরকান', বেরিলী।

২। সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারী-দারুল ইরশাদ, রায়চোটি, কড়পা, মাদ্রাজ।

৩। সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর-ফুলওয়ারী।

৪। নাযীরুল হক- মিরাটী।

৫। মিস্ত্রি মুহাম্মদ সিদ্দীক-সুলতানপুর লোদি।

৬। ডাঃ সাইয়েদ নাজীর আলী যায়েদী-এলাহাবাদী।

৭। মুহাম্মদ ইবনে আলী উলুবী-কাকোরবী, লাক্ষ্ণৌ।

সাত ব্যক্তির এ মজলিসটি অনেক চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা ও বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব প্রণয়ন করেন, তা হুবহু জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ১০ং দফায় উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যায় ঃ

১। আমীরের নির্বাচন অস্থায়ী হওয়া সম্পর্কে প্রথম দলের অভিমতটি বাতিল করা হয়।

২। আমীর নির্বাচন না করে স্রেফ সংগঠন ও পরিচালনার জন্যে একটি পরিষদ গঠন সম্পর্কিত দ্বিতীয় দলের অভিমতটিও গৃহীত হয়নি।

৩। তৃতীয় দলের এ অভিমতটি গৃহীত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং

বুদ্ধি-বিবেচনা একথাই দাবী করে যে, আমীরবিহীন জামায়াত হতে পারে না এবং আমীরের নির্বাচনও কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না।

৪। প্রথম দলের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে নীচের দুটো বাক্যে ঃ

"আমীরের আল্লাহভীরুতা ও দায়িত্ববোধের নিকট আশা করা যাবে যে, নিজের চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তির আগমনে তিনি নিজেই তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিবেন। এছাড়াও জামায়াত তার উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন অনুভব করলে আমীরকে বরখাস্ত করার অধিকারও রাখবে।"

দ্বিতীয় দলের প্রশ্নের জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ "জামায়াতের দৃষ্টিতে নির্বাচনের সময় যে ব্যক্তিই উল্লিখিত গুণাবলীর (তাকওয়া, দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, নির্ভুল রায় দেবার ক্ষমতা, দৃঢ় ইচ্ছা ও হিম্মত) পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্যতর বিবেচিত হবে, তাকেই সে এ পদের জন্য নির্বাচিত করবে।"

বিকেল চারটেয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাধারণ সভায় মওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী মজলিসের পক্ষ হতে প্রস্তাবটি পড়ে শোনালেন এবং সংক্ষেপে এটির ব্যাখ্যাও করলেন। জামায়াত সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করলো এবং ফয়সালা করলো যে, এ প্রস্তাবটি জামায়াতের গঠনতন্ত্রে দশ নম্বর দফা হিসাবে স্থান লাভ করবে। অতঃপর সবাই সম্মিলিতভাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবকে আমীর নির্বাচন করলেন। এ ক্ষেত্রে বাইয়াত করার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। বরং সমগ্র জামায়াত এককণ্ঠে শপথ করলো যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা আমীরের আনুগত্য এবং তার নির্দেশ পালন করবে।

এই 'বাইয়াতে আম' অনুষ্ঠানের সময়ও আবার ঠিক সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি হলো, যেমন একদিন পূর্বে নতুন ঈমানের স্বীকারোক্তি করার সময় হয়েছিল। সবাই আবার আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করলেন, কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করলেন যেন আল্লাহ এই জামায়াতকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী চলার সুযোগ দান করেন।

সর্বশেষে আমীরে জামায়াত উঠে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "আপনাদের মধ্যে আমি সবচাইতে বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলাম না, বা সবচাইতে বেশি মুত্তাকী-পরহেযগারও ছিলাম না, এমন কোন বৈশিষ্ট্যও আমার ছিল না যার সাহায্যে আপনাদের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু তবু যখন আমার উপর বিশ্বাস করে আপনারা এ বিরাট কাজের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন, তখন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আর আপনারাও দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা দান করেন এবং আপনাদের এ বিশ্বাসকে নৈরাশ্যে পরিবর্তিত না করেন। আমি নিজের

সামর্থ মোতাবেক পূর্ণ আল্লাহভীতি এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধের সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমি স্বেচ্ছায় নিজের কর্তব্য সম্পাদনে কোনো প্রকার ক্রটি করবো না।

আমি নিজের জ্ঞান মোতাবিক আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। তবু যদি কোনো ব্যাপারে আমার পদস্খলন হয় এবং আপনাদের মধ্য থেকে কেউ অনুভব করেন যে, আমি সত্য-পথ থেকে সরে গিয়েছি, তাহলে আমার সম্পর্কে এ কু-ধারণা পোষণ করবেন না যে, আমি জেনে-বুঝে এমনি করছি বরং সু-ধারণা পোষণ করে উপদেশ দিয়ে আমাকে সোজা করবার চেষ্টা করবেন। আমার উপর আপনাদের অধিকার এ মর্মে স্বীকৃত হয়েছে যে, আমি নিজের আরাম-আয়েশ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট জামায়াতের স্বার্থ এবং তার কাজের দায়িত্বকে প্রাধান্য দেবো, জামায়াতের সংগঠনের সংরক্ষণ করবো, জামায়াতের রুকনদের মধ্যে ইনসাফ ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে ফয়সালা করবো, জামায়াতের পক্ষ থেকে আমার নিকট যে আমানত রাখা হয়, তার সংরক্ষণ করবো এবং সবচাইতে বড় কথা হলো এই যে, নিজের মন-মগজ, দেহের সমস্ত শক্তিকে সেই উদ্দেশ্যের সেবায় নিয়োজিত করবো যে জন্য আপনাদের জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আর আপনাদের উপর আমার অধিকার হলো এই যে, যতক্ষণ আমি সোজা-সত্য পথে চলবো, ততক্ষণ আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন, আমার নির্দেশ মেনে চলবেন, সৎপরামর্শ এবং সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে সমর্থন করবেন এবং জামায়াতের সংগঠনকে বিকৃত করার পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

আমি এ আন্দোলনের বিরাটত্ব এবং আমার নিজের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন আছি। আমি জানি বিপুল হিম্মতের অধিকারী পয়গম্বরগণ যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এটি সেই আন্দোলন এবং নবুয়াতের যুগ অতীত হবার পর মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষেরা একে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

এ বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা আমার রয়েছে, এ ভুল ধারণা এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনে স্থান লাভ করতে পারেনি। বরং আমি তো এটাকে একটা দুর্ভাগ্য মনে করি যে, এ মুহূর্তে এ বিরাট কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য আপনারা আমার চাইতে ভালো লোক পেলেন না। আমি আপনাদেরকে ভরসা

দিচ্ছি যে, আমীরের দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে আমি সর্বদা এ বোঝা বহন করার মত একজন যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান করতে থাকবো এবং যখনই এমন কোনো লোকের সন্ধান পাবো, তখনই আমি নিজেই সর্বপ্রথম তার হাতে বায়াত করবো। এছাড়া প্রত্যেক সাধারণ সভার সময় আমি জামায়াতের নিকটও আবেদন করবো যে, এখন যদি তারা আমার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান পেয়ে থাকেন, তাহলে তাকেই আমীর নির্বাচন করতে পারেন এবং আমি সানন্দে এই পদ ত্যাগ করবো।

সার কথা হলো এই যে, ইনশাআল্লাহ আমার নিজের সত্তাকে আমি কখনো আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড় করাতে চাই না এবং কাউকে একথা বলার সুযোগও দেবো না যে, একজন অযোগ্য ব্যক্তি জামায়াতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কাজেই আমরা এতে শামিল হতে পারি না। না, আমি বলছি, যে কোন যোগ্য ব্যক্তি আসুক, তাহলে এই যে মর্যাদা আপনারা আমাকে দান করেছেন, তা হামেশা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তবে অন্য কেউ যদি এ কাজ পরিচালনা করতে প্রস্তুত না হন, তাহলে আমিও প্রস্তুত হবো না, এমনটি নয়। এ আন্দোলন তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমার জীবন-মৃত্যু এরই জন্য। কেউ এ পথে চলতে প্রস্তুত হোক বা না হোক, আমাকে অবশ্যই এ পথে চলতে হবে এবং এ জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে। কেউ অগ্রসর না হলে আমি একাই অগ্রসর হবো। কেউ সহযোগী না হলে আমি একাই চলবো। সমগ্র দুনিয়া একজোট হয়ে বিরোধিতা করলেও আমি একাই তার সঙ্গে লড়াই করতে একটুও ইতস্তত করবো না।

পরিশেষে একটি কথা পরিষ্কার করে দিতে চাই। ফিকাহ ও ইলমে কালামের বিষয়ে আমার নিজস্ব একটি পদ্ধতি আছে। আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান-গবেষণার ভিত্তিতে আমি এটি নির্ণয় করেছি। গত আট বছর যারা 'তারজুমানুল কুরআন' পাঠ করেছেন, তারা একথা ভালোভাবেই জানেন।

বর্তমানে এই জামায়াতের আমীরে পদে আমাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাজেই একথা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হচ্ছে যে, ফিকাহ ও ইলমে কালামের বিষয়ে ইতিপূর্বে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু লিখবো অথবা বলবো, তা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের ফয়সালা হিসেবে গণ্য হবে না বরং হবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায়কে জামায়াতের অন্যান্য আলেম ও গবেষকদের উপর চাপিয়ে দিতে আমি চাই না এবং আমি এও চাই না যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে আমার উপর এমন সব বিধি-

নিষেধ আরোপ করা হবে যার ফলে ইলমের ক্ষেত্রে আমার গবেষণা করার এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হবে।

জামায়াতের সদস্যদেরকে (আরকান) আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে নির্দেশ দিচ্ছি যে, ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কিত আমার কথাকে আপনারা কেউ অন্যের সামনে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করবেন না। অনুরূপভাবে আমার ব্যক্তিগত কার্যাবলীকেও– যেগুলোকে আমি নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার পর জায়েয মনে করেছি– অন্য কেউ যেন প্রমাণ স্বরূপ তা গ্রহণ না করেন এবং নিছক আমি করেছি এবং করছি বলে যেন বিনা অনুসন্ধানে তার অনুসারী না হন। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।

যারা দীনের ইল্‌ম রাখেন, তারা নিজের গবেষণা-অনুসন্ধান মোতাবিক আর যারা ইল্‌ম রাখেন না, তারা যার ইলমের উপর আস্থা রাখেন, তার গবেষণা-অনুসন্ধান মোতাবিক কাজ করে যান। উপরন্তু এ ব্যাপারে আমার বিপরীত মতপোষণ করার এবং নিজের মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের রয়েছে। আমরা প্রত্যেকেই ছোটখাটো এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন মতের অধিকারী হয়ে পরস্পরের মোকাবিলায় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েও একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারি– যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন।"

৪ঠা শাবান ঃ গতকাল বিকালে আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচন করেছিলেন। আজ সকাল ৮টায় শূরার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। আন্দোলনের ভবিষ্যত এবং জামায়াতের কর্মসূচি সম্পর্কে চিন্তা করা হলো। অনেক চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনার পর নিম্নলিখিত ফয়সালাগুলো গৃহীত হলো ঃ

কর্মবণ্টন

আপাতত জামায়াতের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত বিভাগসমূহে বিভক্ত করা হলো ঃ

১। শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ

এ বিভাগের কাজ হবে–

ইসলামী চিন্তা ও জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং কার্যকর দিক সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা, দুনিয়ার অন্যান্য চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থাকে সমালোচনা ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা এবং সর্বশেষে নিজের গবেষণালব্ধ বস্তুকে এমন উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে পেশ করা, যা শুধু ইসলামী নীতির ভিত্তিতে চিন্তা ও মানস জগতে বিপ্লব সংঘটিত করেই ক্ষান্ত হবে না, বরং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী ব্যবস্থাকে কার্যত প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

এমন একটি শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা, যা ইসলামের প্রাণশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে এবং দুনিয়ায় ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে দুনিয়ায় প্রচলিত শিক্ষাদর্শ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও সমালোচনা ও অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতে হবে।

নিজেদের শিক্ষাদর্শ মোতাবেক পাঠ্য তালিকা ও শিক্ষক তৈরি করা এবং অবশেষে একটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করে ভবিষ্যত বংশধরদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দানের কাজ শুরু করা।

এমন একটি শিক্ষায়তন এবং অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন করা, যা মুসলিম জাহানে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মী তৈরি করার কাজ করবে। তিন বছর আগে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠান নামে যে প্রতিষ্ঠানটি কায়েম করা হয়েছিল, সেটিকে জামায়াতে ইসলামীর এ বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। আপাতত এ বিভাগটি কেন্দ্রে আমীরে জামায়াতের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকবে। পরে সম্ভব হলে এর শাখা দেশের অন্যান্য এলাকায়ও কায়েম করা হবে যেখানে এ ধরনের একটি বিভাগ পরিচালনা করার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে।

জামায়াতের সমস্ত কর্মী এবং বিশেষ করে স্থানীয় জামায়াতের আমীরদের কর্তব্য হবে, তারা কোথাও এ বিভাগে কাজ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সন্ধান পেলে তার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমীরে জামায়াতকে জানাবেন।

এছাড়াও স্থানীয় জামায়াতগুলোকে এদিকেও নজর রাখতে হবে যে, নিজেদের হালকা (Zone) থেকে তারা যে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে গবেষণা বিভাগের জন্য কেন্দ্রে প্রেরণ করবে, তার জীবন ধারণের ব্যয়ভার বহন করার জন্যও যেন স্থানীয়ভাবে তারা চেষ্টা করে। উপরন্তু স্থানীয় জামায়াতগুলো এ বিভাগকে অন্যভাবেও সাহায্য করতে পারে। এর লাইব্রেরীর জন্য তারা বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চমানের কিতাবপত্র হাসিল করার চেষ্টা করতে পারে।

২। প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

গবেষণা ও শিক্ষা বিভাগ যে সাহিত্য সৃষ্টি করবে, তা প্রচার ও পরিবেশনের দায়িত্ব থাকবে এ বিভাগটির উপর। জামায়াতের সাহিত্যকে আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই হবে এর কাজ। এ বিভাগটির জন্য প্রচার ও প্রকাশনা কার্যে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন। এছাড়াও এ বিভাগে এমন কর্মীরও প্রয়োজন রয়েছে, যারা সফর করে বিভিন্ন স্থানে যাবেন, বিভিন্ন হালকায় মৌখিক প্রচার করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতের সাহিত্যও পরিবেশন করবেন।

আপাতত এ বিভাগটিও কেন্দ্রে আমীরে জামায়াতের তত্ত্বাবধানে থাকবে। পরে চেষ্টা করা হবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বশীল লোকদের তত্ত্বাবধানে প্রচার ও প্রকাশনার ছোট ছোট কেন্দ্র কায়েম করার। সেখান থেকে জামায়াতের প্রতিনিধিত্বশীল সংবাদপত্র, মাসিক পত্র অথবা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে।

জামায়াতের আরকান এবং স্থানীয় জামায়াতগুলো এ বিভাগের সঙ্গে দুটি উপায়ে সহযোগিতা করতে পারে।

প্রথমত, যারা প্রকাশনার কাজ অথবা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ অথবা ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের কাজ করতে পারেন অথবা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বিভাগটিকে সাফল্যমন্ডিত করার যোগ্যতা রাখেন, তারা নিজেদের খেদমত পেশ করবেন এবং স্থানীয় জামায়াতের আমীরগণ এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় জামায়াত প্রত্যেক স্থানে একটি পাঠাগার এবং বুক ডিপো কায়েম করবে। এতে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত হবে। আগ্রহশীল ব্যক্তিরা পাঠাগারে বসে এগুলো পড়তে পারবেন এবং যারা খরিদ করতে চাইবেন, তাদের জন্য বুক ডিপোর দ্বার উন্মুক্ত থাকবে।

৩। জামায়াতের সাংগঠনিক বিভাগ

এ বিভাগের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) কর্মীদের নির্দেশ দেয়া।

খ) যেখানে স্থানীয় জামায়াত গঠিত হয়েছে, সেখানে কাজের তত্ত্বাবধান করা, তাদের নিকট থেকে রিপোর্ট তলব করা এবং তাদেরকে পরামর্শ দেয়া।

গ) যেখানে পৃথক পৃথকভাবে জামায়াতের সদস্যগণ রয়েছেন, সেখানে স্থানীয় জামায়াত গঠন করার চেষ্টা করা।

ঘ) যেসব জামায়াত অথবা প্রতিষ্ঠান এ জামায়াতের বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে একমত, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা।

ঙ) আন্দোলনের গতি পর্যালোচনা করা এবং তাকে অগ্রবর্তী করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

৪। অর্থ বিভাগ

দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র ১৯৪১ সালের ৩১শে আগস্ট নাগাদ শেষ করে জামায়াতে ইসলামীর কাছে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় বাইতুলমাল কায়েম করা হয়েছে। এটি সরাসরি জামায়াতের আমীরের অধীনে থাকবে। এছাড়া প্রত্যেকটি স্থানীয় জামায়াত সম্পর্কে ফয়সালা করা হয়েছে যে, প্রত্যেককেই তার নিজস্ব বাইতুলমাল কায়েম করতে হবে। স্থানীয় আমদানী থেকেই স্থানীয় প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে।

ত্রৈমাসিক হিসাব সংশ্লিষ্ট হালকার আমীর, সহকারী আমীর অথবা হালকা না থাকলে সরাসরি জামায়াতের আমীরের নিকট পাঠাতে হবে। এবং কখনো কেন্দ্রীয় বাইতুলমালকে সাহায্য দানের প্রয়োজন হলে আমীরের পক্ষ থেকে নির্দেশনামা পেয়েই নির্ধারিত অর্থ পাঠাতে হবে।

বর্তমানে আয়ের সবচাইতে বড় মাধ্যম হলো দারুল ইসলামের বইপত্র। এগুলো বেশি সংখ্যায় প্রকাশ করার উপর জামায়াতের কাজের উন্নতি নির্ভরশীল। এ খাতের সমস্ত আয় কেন্দ্রীয় বাইতুলমালে আসা উচিত।

দ্বিতীয় মাধ্যম হলো যাকাত। জামায়াতের যেসব সদস্যের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, তারা সবাই নিজেদের যাকাত স্থানীয় জামায়াতের বাইতুলমালে জমা দেবেন অথবা স্থানীয় জামায়াত না থাকলে সোজাসুজি কেন্দ্রে পাঠাবেন।

তৃতীয় মাধ্যম হলো সাহায্য। জামায়াতের যেসব সদস্য সামর্থ রাখেন বেশি করে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে আর্থিক দিক দিয়ে জামায়াতকে শক্তিশালী করা তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। অবশ্য জামায়াতের বাইরের লোকদের থেকে কোনো প্রকার সাহায্য চাওয়া উচিত নয়। তবে যদি তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোনো শর্তহীন সাহায্য দিতে চায়, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কোনো বৃহত্তম সাহায্যও গ্রহণ করা হবে না, যখন আশংকা থাকে যে, এর ফলে জামায়াতের নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করা হবে।

এ প্রসঙ্গে জামায়াতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বর্ণনা করা সংগত বলে মনে করছি। ১৯৩৮ সালে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সময় জামায়াতের বর্তমান আমীর মওলানা মওদূদী তাঁর সমস্ত বই (আল জিহাদ ফিল ইসলাম, রেসালায়ে দীনিয়াতের উর্দু ও ইংরেজী সংস্করণ ছাড়া) প্রতিষ্ঠানকে ওয়াকফ করে দেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই জানুয়ারী থেকে ১৩২ টাকা মূলধন সম্বল করে এ কাজ শুরু করা হয়।

৫। দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ

এটি জামায়াতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এবং আসলে এ বিভাগটির কর্মতৎপরতার উপর সাফল্য নির্ভরশীল। জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেকেই অবশ্যই এ বিভাগের সদস্য হবেন। প্রত্যেককে সদাসর্বদাই একজন মুবাল্লিগ-ইসলাম প্রচারকের জীবন যাপন করতে হবে। তার কর্তব্য হবে ঃ যেখানে যে পরিবেশে তিনি পৌঁছুবেন, সেখানেই জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার করবেন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে সবাইকে দাওয়াত দেবেন এবং জামায়াতের সংগঠনের ব্যাখ্যা করবেন।

কিন্তু প্রচারের সুবিধার্থে প্রয়োজন মনে করা হয়েছে যে, কাজ করার জন্য আটটি ভিন্ন ভিন্ন হালকা (Zone) নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক জামায়াতের প্রত্যেকটি কর্মী নিজের যোগ্যতানুসারে শুধু সেই হাল্কার গ্রুপের মধ্যে প্রচারের কাজ করবেন যার সঙ্গে তিনি বেশি সম্পর্ক রাখেন। ঐ হালকাগুলো (Zones) নিম্নরূপ ঃ

১। কলেজ ও আধুনিক শিক্ষিতদের হালকা
২। আলেম সমাজ ও আরবী মাদ্রাসার হালকা
৩। সূফী ও তরীকতপন্থী শায়খদের হালকা

৪। রাজনৈতিক দলের হালকা

৫। শহুরে জনগণের হালকা

৬। গ্রাম্য জনসাধারণের হালকা

৭। মহিলাদের হালকা

৮। অমুসলিমদের হালকা।

প্রত্যেক কর্মীকে নিজের সম্পর্কে যথার্থ আন্দাজ করা উচিত যে, এ হালকাগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টার অথবা কোন্‌গুলোর মধ্যে কাজ করার যোগ্যতা সে নিজের মধ্যে অনুভব করে। অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে জানতে পারে যে, সে অমুক হালকার মধ্যে ব্যর্থ হবে, কাজেই তার মধ্যে প্রচারকার্যে নিযুক্ত হওয়া থেকে তাকে বিরত থাকা উচিত, যাতে করে সে মানুষকে নিকটে আনার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেবার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

প্রচারের ব্যাপারে যে সব সমস্যা দেখা দেবে, তার সমাধানের জন্য স্থানীয় জামায়াতের আমীর, তার সহকারী অথবা সরাসরি জামায়াতের আমীরের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে।

নির্দেশাবলী

উপরোল্লিখিত কার্যসূচি নির্ধারিত হবার পর ৪র্থ শাবানেই পুনর্বার একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামায়াতের আমীর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এ কার্যসূচি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি কাজ করার জন্য কর্মীদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী দান করেন।

১। যে বস্তিতে দু'জন লোক জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছেন, সেখানে অবশ্যই একটি স্থানীয় জামায়াত গঠন করতে হবে। তাদের দু'জনের মধ্য থেকে অধিকতর সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থানীয় আমীর নির্বাচন করতে হবে। এ ব্যাপারে জামায়াতের আমীরকে ওয়াকিফহাল করে তার নির্বাচন মঞ্জুর করাতে হবে।

অনুরূপভাবে যেখানে দু'জনেরও বেশি জামায়াতে শরীক হবেন, সেখানেও সকল স্বার্থের ঊর্ধে এমন একজনকে জামায়াতের আমীর মনোনীত করতে হবে যিনি বেশি সচ্চরিত্র, শরীয়তের অনুগত, বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন, ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং মহল্লার লোক যাকে সাধারণত সম্মানের চোখে দেখে থাকেন।

কিন্তু স্থানীয় লোকেরা কাউকে স্থানীয় আমীর নির্বাচিত করে নিলেই যথেষ্ট হবে না, জামায়াতের আমীর তার নির্বাচনের মঞ্জুরী দিলে তবেই তা কার্যকর হবে।

২। জামায়াতের আমীর যদি সামষ্টিক স্বার্থে কাউকে স্থানীয় আমীরের অথবা অন্য কোনো পদে নিযুক্তি না দেন অথবা কাউকে বরখাস্ত করে অন্যকে তদস্থলে নিযুক্তি দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে আসল বিষয় হলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খেদমত, ব্যক্তিগত সম্মান নয়। যে ব্যক্তিকে আপনি জামায়াতের আমীর নির্বাচিত করেছেন, তার উপর আস্থা স্থাপন করুন। তিনি জামায়াতের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই নিযুক্তি ও বরখাস্তের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। জামায়াতে কোন ব্যক্তি শামিল হলে তার মধ্যে পূর্ণ দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে নতুন করে তার মুখ দিয়ে কালেমায়ে শাহাদত পড়াতে হবে। ঈমানের এ পুর্নরাবৃত্তির অর্থ এ নয় যে, আজ যে ব্যক্তি ঈমানের পুনরাবৃত্তি করেছে, সে এতদিন পর্যন্ত কাফের ছিল এবং এইমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলো। বরং এর অর্থ শুধু এই যে, তার এবং আল্লাহর মধ্যে যে চুক্তি প্রথম থেকেই ছিল, আজ তাকে তাজা, নবায়ন, শক্তিশালী এবং আল্লাহর জন্য একক করে নেয়া হচ্ছে।

ঈমানের পুনরাবৃত্তি করার সময় প্রত্যেক নতুন প্রবেশকারীর মনের মধ্যে একথা ভালো করে বসিয়ে দেয়া উচিত যে, আসলে এখন থেকে তোমার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হচ্ছে। আজ থেকে তুমি একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করতে প্রস্তুত হয়েছো এবং তুমি আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে সাক্ষী রেখে ফয়সালা করেছো যে, তোমার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য এ ব্যবস্থার আনুগত্য করার কাজে ব্যয়িত হবে।

৪। যে ব্যক্তি জামায়াতে শামিল হবে তাকে ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ বই-পত্র পড়িয়ে নেয়া উচিত। এতে করে সে ইসলামী আন্দোলনের সকল দিক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে এবং আন্দোলনের সদস্যগণের মনোজগতে ও কর্মক্ষেত্রে একাত্মতা সৃষ্টি হবে। এ ব্যাপারে কারোর সম্পর্কে এ ধারণা করা উচিত নয় যে, সে আগে থেকেই সবকিছু বোঝে। এ ধারণার ভিত্তিতে এ জাতীয় লোকদের একটা বিরাট অংশ যদি জামায়াতের মধ্যে শামিল হয়ে যায়– যারা জামায়াতের বইপত্রের সঙ্গে পরিচিত নয়– তাহলে আশংকা আছে যে, জামায়াতের সদস্যরা পরস্পর বিরোধী কথা এবং কার্য করতে শুরু করবেন। যারা শিক্ষিত নন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেয়া উচিত এবং আন্দোলনের মেজাজ অনুযায়ী তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্য প্রত্যেক স্থানীয় জামায়াতে কমপক্ষে দু'জন লোক এমন থাকা উচিত, যারা গভীরভাবে আমাদের বইপত্র পড়েছেন।

৫। স্থানীয় আমীরগণ নিজেদের হালকার সদস্যদের যোগ্যতা ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করবেন এবং যে ব্যক্তি যে কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন তাকে সেই কাজ সোপর্দ করে দেবেন। অতঃপর ঐ সদস্য তার কাজ কিভাবে সম্পন্ন করেন সেদিকে তিনি বরাবর নজর রাখবেন। এ ব্যাপারে জামায়াতের প্রত্যেক সদস্যকে তার নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে (একটুখানিও কম-বেশি না করে) আন্দাজ করা উচিত এবং তিনি কোন্ কাজটা করতে পারবেন আর কোন্‌টা পারবেন না, তা তার নেতাকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

৬। যেখানে স্থানীয় জামায়াত আছে, সেখানে জামায়াতের সদস্যদেরকে প্রত্যেক জুমার দিন সকাল-সন্ধ্যায় অথবা জুমার-নামাযের পর একত্র হওয়া উচিত। এ বৈঠকে গত সপ্তাহের কাজ পর্যালোচনা করে আগামী কাজের জন্য পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রস্তাবের কথা চিন্তা করতে হবে, বাইতুলমালের হিসাবপত্র দেখতে হবে এবং আন্দোলনের সাহিত্য সম্পর্কিত কোনো নতুন জিনিস প্রকাশিত হলে তা অধ্যয়ন করতে হবে।

৭। জামায়াতের সদস্যদের কুরআন, নবী করীমের স. সীরাত এবং সাহাবায়ে কিরামের সীরাত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল হওয়া উচিত। এ জিনিসগুলোকে বারবার গভীর দৃষ্টিতে পড়া উচিত এবং পড়তে হবে শুধু ভক্তি ও শ্রদ্ধার পিপাসা পূর্ণ করার জন্য নয়-হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ পাবার জন্য। যেখানে দরসে কুরআন দেবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকেন, সেখানে দরসে কুরআন শুরু করা উচিত।

৮। আসলে তাআল্লুক বিল্লাহ- আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক হলো এ আন্দোলনের প্রাণ। আল্লাহর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে আপনি হুকুমাতে ইলাহিয়া কায়েম করার এবং তাকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারবেন না। কাজেই ফরয ইবাদত ছাড়াও নফল ইবাদত করারও বিশেষ চেষ্টা করুন।

নফল নামায, নফল রোযা এবং সাদ্‌কা-এসব জিনিস মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। এগুলো করার সময় খুব বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত, যাতে করে রিয়া-প্রদর্শনেচ্ছা সৃষ্টি হবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নামায বুঝে পড়ুন। এমনভাবে পড়বেন না যে, কোন মুখস্থ করা কথা রোমন্থন করছেন। বরং এভাবে পড়া উচিত, যেন আপনি নিজেই আল্লাহর নিকট কিছু আরযি পেশ করছেন।

নামায পড়ার সময় নিজের নফসের হিসাব নিয়ে তলিয়ে দেখুন, আলেমুল গায়েবের সম্মুখে যেসব কথা আপনি স্বীকার করছেন আপনার কার্যাবলী তার বিপরীত নয়তো? এবং আপনার স্বীকারোক্তি মিথ্যা নয়তো? এভাবে নফসের পর্যালোচনা করে নিজের যে ত্রুটি অনুভব করেন সেজন্য ইস্তেগফার করুন এবং ভবিষ্যতে এগুলোকে দূর করার বিশেষ ব্যবস্থা করুন।

ইবাদতের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন, যতটুকু আমল আপনি স্থানীয়ভাবে নিয়মিত করতে পারবেন শুধু ততটুকুর উপর জোর দিন। উপরন্তু সহীহ হাদীস থেকে যেসব মুজাহাদা, রিয়াযাত এবং মাশাগিল প্রমাণিত না হয়, সেগুলো থেকে দূরে থাকাই উচিত এবং হাদীস সহীহ-নির্ভুল হবার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কথাই প্রামাণ্য হতে পারে, অ-মুহাদ্দিসগণের কথা নয়– তা তারা যত বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্নই হোক না কেন।

বেশি ভয়ংকর বিদআত সেই খারাপ জিনিসগুলো নয়– যেগুলোর দোষক্রটি সম্পর্কে সবাই ওয়াকিফহাল, বরং সেসব আপাত ভালো জিনিসগুলোই বেশি ভয়ংকর যেগুলোকে ভালো মনে করে শরীয়তের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়।

৯। জামায়াতের সদস্যদের একথা ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত যে, তারা একটি বৃহত্তম দাবী নিয়ে একটি বৃহত্তম কাজে অগ্রণী হয়েছেন। যদি তাদের দাবীর তুলনায় তাদের চরিত্র এত বেশি নিম্নমুখী হয় যে, তার নিম্নমুখীনতা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হতে থাকে, তাহলে তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দাবীকে হাস্যাস্পদ করে ছাড়বেন।

এ জন্য জামায়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দ্বিগুণ দায়িত্ব অনুভব করা উচিত। আল্লাহর নিকট তো অবশ্যি দায়ী কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টির সম্মুখেও তার দায়িত্ব বড়ো কঠিন। যে মহল্লায় আপনি থাকবেন, সেখানকার জনসমাজের তুলনায় আপনার চারিত্রিক মান উন্নততর পর্যায়ের হতে হবে। বরং চারিত্রিক পবিত্রতা, নৈতিক উন্নতি ও আমানতদারীর দিক দিয়ে আপনাকে এমন হতে হবে যেন লোকেরা আপনাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করে।

আপনার একটি সামান্য ত্রুটি কেবল জামায়াতের নয়, ইসলামের গায়েও কলংক লেপন করবে এবং এটি বহু লোকের গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১০। জামায়াতের সদস্যদেরকে এমন সব পদ্ধতি থেকে দূরে থাকা উচিত, যা তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে একটি ফেরকায়–সম্প্রদায়ে পরিণত করে। সাধারণ মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে নামায পড়বেন না। নামাযে নিজের জামায়াত পৃথক করবেন না। বিতর্ক করবেন না। যেখানে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয়, গোঁড়ামি ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে এ আন্দোলন সম্পর্কে বিতর্ক উত্থাপন করা হয়, সেখানে সবর-সংযম এখতিয়ার করুন। (বিশেষ করে যেখানে আমার নিজের সত্তার উপর হমলা করা হয়, সেখানে কখনোই জবাব দেবেন না। আমি নিজেই নিজের প্রতিরক্ষা করি না এবং আমার সহযোগীরা এই বাজে কাজে নিজেদের শক্তি ও সময় নষ্ট করবে, এও আমি চাই না)।

অবশ্যই যেখানে কোনো ব্যক্তি সত্যিকার দায়িত্ববোধের সঙ্গে সত্য সন্ধানে ব্রতী হন, সেখানে নিজের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারেন। কিন্তু যখনই অনুভব করবেন যে, আলোচনায় উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখনই আলোচনা বন্ধ করে দেবেন। কেননা, বিতর্ক এমন একটি আপদ যা থেকে শত শত ফিত্‌না ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং এর একটিকেও দূর করা যায় না।

১১। ইসলামী আন্দোলনের একটি বিশেষ মেজাজ আছে। এর একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতিও আছে। এর সঙ্গে অন্য আন্দোলনের পদ্ধতির কোন মিল নেই। যেসব লোক এতদিন অন্যান্য জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যাদের মন-মেজাজ ঐসব আন্দোলনের পদ্ধতি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে, তাদেরকে এ জামায়াতে এসে অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হবে।

সভা, শোভাযাত্রা, শ্লোগান, পতাকা উত্তোলন, ইউনিফরম, বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রস্তাবগ্রহণ, লাগামহীন বক্তৃতা, গরম গরম বিবৃতি এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছু হলো ঐসব আন্দোলনের প্রাণ, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের জন্য এগুলো প্রাণসংহারক বিষের তুল্য। এখানকার কর্মপদ্ধতি শিক্ষা করুন কুরআন, রসূলুল্লাহর সীরাত এবং সাহাবা কিরামের জীবন থেকে এবং এতে অভ্যস্ত হোন।

মুখ, লেখনী অথবা বিক্ষোভের মাধ্যমে জনগণের উপর জাদু করে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় নিজের চারিদিকে জমিয়ে তুলবেন এবং তাদেরকে ইচ্ছামতো হাঁকিয়ে ফিরবেন, এর প্রয়োজন আপনার নেই। সত্যিকার ইসলামের সঙ্গে তাদেরকে পরিচিত করানোই আপনার কাজ। এবং সত্য-জ্ঞান সৃষ্টি করার পর তাদের মধ্যে এমন দৃঢ় ইচ্ছা পয়দা করতে হবে যার ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন এবং চতুষ্পার্শ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজ জীবনকে ঐ জ্ঞান মোতাবেক গড়ে তুলবে এবং যাবতীয় বাতিলকে ধ্বংস করার জন্য জান-মাল কুরবানী করতে তৎপর হবে।

কবিত্ব ও জাদুর মাধ্যমে মানুষের এ বিপুল পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। আপনাদের মধ্যে যারা বক্তা আছেন, তাদের অতীতের বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। দায়িত্বশীল মু'মিনের ন্যায় মাপাজোকা বক্তৃতা করার অভ্যাস করুন। যারা লেখার অভ্যাস রাখেন, তাদেরকেও দায়িত্বহীন লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির লিখন-পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যিনি লেখার সময় এ অনুভূতি রাখেন যে, তাকে তার প্রত্যেকটা শব্দের হিসাব দিতে হবে।

১২। ইসলামী আন্দোলনের কাজ করার জন্য আরো প্রয়োজন হলোঃ আপনার চতুষ্পার্শ্বে একান্ত দুনিয়াদার লোকেরা যে হাংগামা সৃষ্টি করে রেখেছে, যার সঙ্গে আপনার আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, তা থেকে আপনাকে এত বেশি সম্পর্কহীন হয়ে থাকতে হবে যেন আপনার চোখে তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

আপনাকে এ্যাসেম্বলী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এবং এসবের নির্বাচন থেকে এবং হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি জাতির মানসিক বিবাদ এবং বিভিন্ন দল, ধর্মীয় সম্প্রদায়, স্থানীয় গোত্র ও খান্দানের বিবাদ থেকে একেবারেই পৃথক থাকতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের পেছনে ধাবিত হোন। দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে হতে দিন। যে কাজ আল্লাহর পথে হচ্ছে না তাতে লিপ্ত হয়ে আপনি নিজের সময় ও শক্তির-অপচয় করবেন না। কেননা আপনাকে নিজের সময় ও শক্তির হিসাব দিতে হবে।

১৩। নিজের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে হিকমত ও উত্তম নসিহতের দিকে নজর রাখবেন। হিকমত হলেঃ যাকে আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার মানসিকতা অনুধাবন করুন, তার ভুল বুঝাবুঝি অথবা গোমরাহীর আসল কারণ চিহ্নিত করুন। অতঃপর তাকে এমনভাবে বলুন যা তার অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খায়।

আর উত্তম উপদেশ হলোঃ যার নিকট আপনি দাওয়াত পেশ করছেন, তাকে দুশমন অথবা বিরোধী পক্ষীয় হিসেবে নয়, বরং তার মঙ্গলাকাঙ্খী এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে পেশ করুন এবং পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে এমন মধুর ভাষায় ও সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে তাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করুন, যাতে কোনরূপ তিক্ততা সৃষ্টি হতে না পারে। এই সঙ্গে আরো দুটো কথা স্মরণ রাখতে হবে।

এক ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে হিদায়াতের ঊর্ধে মনে করে এবং দুনিয়ার জীবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছে তার পিছনে পড়বেন না। বরং যার মধ্যে এই প্রবণতা দেখবেন, তার কাছ থেকে সরে দাঁড়াবেন।

দুই ঃ অসময়ে দাওয়াত প্রচার করবেন না। যখন কোনো ব্যক্তি বা দল হকের দাওয়াত শোনার এবং নসিহত কবুল করার মুডে থাকে না, তখন তাকে দাওয়াত দেবেননা। একই সময়ে সে যতটা খাদ্য গ্রহণ করতে পারে তার চাইতে বেশি খাদ্য তার মুখে ঢেলে দেবার চেষ্টা করবেন না। জোরজবরদস্তি, অনুরোধ-উপরোধ করা এবং এ ধরনের পদ্ধতিগুলোকে প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যবহার করা ভালোর পরিবর্তে মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কাজ করার আগ্রহে অনেকে এই সীমারেখাগুলোর দিকে নজরই দেন না। অথচ ইসলাম একটি হিকমতপূর্ণ দীন এবং এর মুবাল্লিগ-প্রচারককে হাকিম হতে হবে।

এ নির্দেশাবলী দেবার পর জামায়াতের আমীর এবং মজলিসে শূরার সদস্যগণ একটি পৃথক কামরার মধ্যে গিয়ে বসেন। তারা জামায়াতের সদস্যদেরকে পৃথকভাবে আহ্বান করে প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের উপর কাজ সোপর্দ করেন। এছাড়াও যেখানে স্থানীয় জামায়াত গঠিত হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমীর নিযুক্ত করেন।

৫ই শাবান ঃ কালকের অবশিষ্ট কাজ আজ সম্পন্ন করে সাধারণ সভা শেষ হয়ে গেল। অতঃপর জামায়াতের আমীর শূরার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করেন ঃ

১। জামায়াতের সদস্যদের মধ্যে যাদের লেখার অভ্যাস আছে, তাদের দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জামায়াতের আদর্শের প্রচার এবং জামায়াত সম্পর্কে

যেসব ভুল খবর প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলোর গতিরোধ করার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে চেষ্টা করা উচিত।

২। জামায়াতের সদস্যদের সাধারণ সভা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য মওসুম ও অন্যান্য দিক দিয়ে মার্চ মাসটাই উত্তম সময়। সাধারণ সভার সময় যাদেরকে আমীরে জামায়াত সংগত মনে করবেন অথবা যাদের সম্পর্কে স্থানীয় আমীরগণ সুপারিশ করবেন, তাদেরকে একমাস ট্রেনিংয়ের জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করতে হবে।

৩। জামায়াতের কতিপয় নির্বাচিত সদস্য-যারা সবদিক দিয়ে জামায়াতের আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন- বছরে একবার একটি অথবা একাধিক প্রতিনিধি দল নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করবেন এবং সাধারণ দাওয়াত ছাড়াও তারা বিশেষ করে দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, দীনী মাদ্রাসা এবং আঞ্জুমানগুলোয় দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

৪। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হবে এ জন্য আবদুল্লাহ মিসরীকে মনোনীত করাও হয়। কিন্তু বর্তমানে নসরুল্লাহ খান আযীয সাহেবের জামায়াতে শরিক হবার পর ঐ প্রস্তাবটিকে আপাতত কার্যকরী করার প্রয়োজন নেই। জামায়াতের প্রয়োজনের জন্য জনাব আযীযের 'মুসলমান'[১] পত্রিকা (লাহোর) বর্তমানে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

১। পরে এর নাম পরিবর্তন করে 'কাওসার' রাখা হয়। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে যখন 'খতমে নবুওয়াত আন্দোলন' অত্যধিক শক্তিশালী হয় এবং লাহোরে সামরিক শাসন জারি হয়, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ ঐ পত্রিকা সম্পাদককে জেলে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে তার জামানতও বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর পুনর্বার এটি আর প্রকাশিত হতে পারেনি। তবে কারামুক্তির পর আযীয সাহেব 'এশিয়া' নামে অন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি আল্লাহর ফযলে এখনো প্রকাশিত হচ্ছে এবং ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে।

মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী

॥ মুহররম, ১৩৬১ হিজরী ॥

যুদ্ধের কারণে দেশে যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে জন্য মার্চে জামায়াত সদস্যদের সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠান সংগত মনে করা হয়নি। এ জন্য আমীরে জামায়াত পরামর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরা আহ্বান করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন ঃ

মুহাম্মদ মনযুর নোমানী	সাহেব	(বেরিলী)
আমীন আহসান ইসলাহী	”	(সরাইমীর)
আবুল হাসান	”	(লাক্ষ্ণৌ)
সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর	”	(কাপুরথলা)
নাযিরুল হক মীরাঠী	”	
মুহাম্মদ আলী কান্ধলুবী	”	(শিয়ালকোট)
আবদুল আযীয শারকী	”	(জালিন্ধর)
নসরুল্লাহ খান আযীয	”	(লাহোর)
চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর	”	(লায়ালপুর)
ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী	”	এলাহাবাদ
মিস্ত্রি মুহাম্মদ সিদ্দীক	”	
আবদুল জব্বার গাযী	”	(দিল্লী)
আতাউল্লাহ	”	(বাংলা)
কামরুদ্দীন খান	”	
মুহাম্মদ বিন আলী উলুব্বী	”	
মুহাম্মদ ইউসুফ	”	(ভূপাল)

১৯৪২ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী মজলিসে শূরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম সদস্যগণ পৃথকভাবে আন্দোলনের সাধারণ গতিভংগি এবং বিশেষ করে নিজেদের এলাকার কাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। স্থানীয় জামায়াতসমূহের সহযোগিতায় যেসব প্রস্তাব তারা আনেন

এবং কাজকে অগ্রবর্তী করার জন্য যেসব বিষয়ের প্রয়োজন অনুভব করতেন সেগুলো পেশ করেন।

অতঃপর আমীরে জামায়াত এক দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে জামায়াতের এ যাবতকালের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করেন। জামায়াতের ব্যবস্থায় কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, এ সবের কারণ কি, আগামীতে জামায়াতের ব্যবস্থাকে উন্নততর করার এবং আন্দালনকে সুষ্ঠুভাবে অগ্রবর্তী করার জন্যে কি ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং কাজের গতি যতটা দ্রুত হওয়া উচিত ততটা নয় কেন, এর মূলে কি কি বাধা-বিপত্তি রয়েছে–এসব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। অতঃপর পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হয় ঃ

১। জামায়াতের কার্যাবলী পর্যালোচনা করার পর জানা গেছে যে, জামায়াতের মধ্যে এমন কিছু লোকও পাওয়া যায়, যারা মনের দিক থেকে এখনো একাগ্র হতে পারেনি। এ জামায়াতের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম না করেই তারা জামায়াতে শামিল হয়ে গেছেন। এদের থেকে সংখ্যায় কিছু বেশি এমন একদল সদস্য আছেন, যাদের জীবনে সন্তোষজনক পরিবর্তন সূচিত হয়নি অথবা যাদের মধ্যে আদর্শের জন্য ভেতর থেকে কাজ করার ইচ্ছা এত বেশি প্রবল হয়নি যে, তারা বাইরের কোন আন্দোলন ছাড়া নিজেদের আন্তরিক বাসনার বশবর্তী হয়ে কর্মতৎপর হবেন। **এই গলদ দূর করার জন্য স্থানীয় জামায়াতসমূহের আমীরগণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে ঃ**

এক ঃ জামায়াত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কাঁচা অথবা আধা পোখতা লোকদেরকে জামায়াতে শামিল করা যাবে না। বরং শুধু তাদেরকেই জামায়াতে শামিল করা হবে, যারা জামায়াতের আদর্শকে পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করেছে, যাদের চিন্তায় বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার লেশমাত্র নেই এবং যারা জামায়াতের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত দায়িত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে।

দুই ঃ সাধারণভাবে লোকদেরকে জামায়াতে শামিল হবার দাওয়াত দেয়া যাবে না, বরং যে বিশ্বাস ও আদর্শের উপর জামায়াত কায়েম রয়েছে, তার প্রচার করতে হবে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যেসব লোক এত বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়বে যে, তাদের জীবনে কার্যত পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার পথ তালাশ করতে থাকবে, তখন তাদের সামনে জামায়াতের গঠনতন্ত্র পেশ করতে হবে।

গঠনতন্ত্র পড়ে জামায়াতে শামিল হবার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে জামায়াতে শামিল করে নেয়া যাবে না, বরং তাদেরকে বারবার চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে। যখন অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করার পর তারা জামায়াতের সদস্যভুক্ত হবার ফয়সালা করবে, তখন শাহাদাত পালনের দায়িত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করার পর তাদের নিকট থেকে শাহাদত আদায় করানো হবে।

তিন ঃ একথা হামেশা জামায়াত সদস্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, জামায়াতে শামিল হবার সময় তারা আল্লাহর নিকট যে শপথ করেছে তা পূর্ণ করা এবং যে দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে তা আদায় করা এখন তাদের নিজেদের কাজ। অন্য কেউ উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নামাবে এমন প্রত্যাশা যেন তারা না করে। বরং নিজেদের ঈমানী শক্তির জোরে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খাতিরে তাদের কর্মতৎপর হওয়া উচিত।

চার ঃ এসব জামায়াত সদস্যদেরকে নামায ও কুরআন বুঝে পড়ার এবং প্রত্যেক নামায ও তিলাওয়াতের সময় আত্ম পর্যালোচনার উপদেশ দেয়া উচিত। কেননা, এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি হবে এবং দিলের মধ্যে এমন আগুন জ্বলে উঠবে, যা তাদেরকে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক স্থানীয় আমীরকে তার জামায়াতের সদস্যদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তাদের মধ্যে যেসব ত্রুটি অনুভূত হবে বুদ্ধি সচেতন পদ্ধতিতে সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

(২) যেহেতু প্রচার ও দাওয়াতের কাজে জামায়াত সদস্যদের নেতৃত্ব দেয়া, সদস্যদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা এবং জামায়াতের আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথে অগ্রসর করা স্থানীয় জামায়াতের আমীরদের কাজ এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য তাদের নিজেদের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে, এ জন্য ফয়সালা করা হয় যে, স্থানীয় জামায়াতের আমীরগণ প্রতি বছর কমছে কম দু-এক মাস করে আমীরে জামায়াতের নিকট এসে থাকবেন। কে কোন্ মাসে আসবেন, এ ফয়সালা করার ভার প্রত্যেকের নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমীরে জামায়াতের সঙ্গে পত্রালাপ করে প্রত্যেকে নিজের মাস নির্ধারিত করে নেবেন। এছাড়াও নিজের হালকার বিশেষ বিশেষ সদস্যদেরকেও তারা ইচ্ছা করলে আনতে পারেন।

৩। জামায়াতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদকে স্থায়ীভাবে কেন্দ্রে অবস্থান করার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে যে, কেন্দ্র এমন কোনো স্থানে স্থাপন করতে হবে, যেখানে শুধু কর্মীদের

শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করা যাবে না, বরং তার আশেপাশের এলাকায় নমুনাস্বরূপ কিছু কাজও করা যেতে পারে।

এতে করে কর্মীগণ দাওয়াত ও তাবলীগের বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের জন্য স্থান নির্বাচন, কেন্দ্রে যেসব ব্যক্তির থাকার প্রয়োজন তাদেরকে বাছাই করা এবং অন্যান্য বাস্তব কার্যাবলীর ভার আমীরে জামায়াতের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

৪। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির ভার এত দিন স্রেফ আমীরে জামায়াতের উপর ছিল। কিন্তু বর্তমানে জামায়াতের লেখক সমাজের নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী এ কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

৫। জামায়াতের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বাইরে থেকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং জামায়াত সদস্যগণ নিজেরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তাবলে এতে যেসব সংশোধনীর প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেছেন, সেসব সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছে এবং সংশোধনের পর ফয়সালা করা হয়েছে যে, নয়া সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হবে।[১]

১। এ প্রস্তাব মোতাবেক সংশোধিত গঠনতন্ত্র ১৯৫২ সালের ১৬শে আগস্ট পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। এ সময়ের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভাগ হলো। এর ফলে জামায়াত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামী পূর্বের গঠনতন্ত্রটিকে নতুন করে তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করলো। এ জন্য ৩৯ সদস্যের সমন্বয়ে একটি 'গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি' গঠিত হলো। এ কমিটি প্রণীত গঠনতন্ত্র ১৯৫২ সালের ২৬শে আগস্ট থেকে ১৯৫৭ সালের ২৬শে মে পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এ সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার ফলে দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় এবং জামায়াতের কার্যসীমাও ব্যাপকতা লাভ করে। এসব কারণে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা ও প্রয়োজন পর্যালোচনা করার পর জামায়াতের গঠনতন্ত্রে আরো পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কাজেই পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সংশোধন ও পরিবর্তনের পর নয়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে। ১৯৫৭ সালের ২৬শে মে তা গৃহীত হয় এবং ঐ বছরের ১লা জুন হতে কার্যকর হয়।

জামায়াতের অস্থায়ী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার অধিবেশনে বিভিন্ন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ফয়সালা করা হয়েছিল যে, একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কায়েম করার জন্য যদি কোনো স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপাতত অস্থায়ীভাবে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সেখানে আমাদের শক্তির একটি বৃহত্তর অংশকে আমরা একত্র করতে এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলী শুরু করতে পারবো।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমে শিয়ালকোট জেলায় একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল এবং বাইরের জামায়াতগুলোর নিকটও এ খবর পৌছে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে কতিপয় কারণে এ নির্বাচন বাতিল করতে হয়। অতঃপর শূরার সদস্যদের পরামর্শক্রমে পাঠানকোটের নিকটবর্তী জামলাপুরে কেন্দ্র স্থানান্তরের ফয়সালা করা হয়। সেখানে চৌধুরী নিয়াজ আলী খান সাহেব ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্গত তাঁর কতিপয় গৃহ জামায়াতকে ভাড়া দিতে সম্মত হয়েছেন। কাজেই এ ফয়সালা অনুযায়ী ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন আমীরে জামায়াত কতিপয় সহযোগীসহ সেখানে স্থানান্তরিত হন এবং সেই সময় থেকেই এ স্থানটিকে জামায়াতের কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়।

এ স্থানটি স্বার্ণা রেল স্টেশন থেকে আনুমানিক দু'ফার্লং দূরে অবস্থিত। আপাতত এটিকেই অস্থায়ীভাবে কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ইন্‌শাআল্লাহ সাধারণ সভায় স্থায়ী কেন্দ্র নির্বাচন করা হবে।

এ নতুন কেন্দ্রে কাজ করার যে নক্‌শা তৈরি করা হয়, তাকে আমরা চারটি শিরোনামায় বিভক্ত করতে পারি ঃ

- এক. শিক্ষা ও অনুশীলন
- দুই. তত্ত্ব-গবেষণা
- তিন. সাধারণ পর্যায়ে দাওয়াত
- চার. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

এ চারটি শিরোনামে আমরা এখানে উল্লিখিত নকশাটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করবো। এর ফলে পরিকল্পিত কাজের ধরন ও তার বাস্তব রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এর সাথে এও জানা যাবে যে, এ কাজ পরিচালনার এবং এর উন্নতি বিধানের জন্য কোন্ ধরনের লোক এবং কি কি উপায়-উপকরণের প্রয়োজন।

জামায়াতে ইসলামীর অধীনে যেসব জামায়াত ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের আমীরদের মাঝে মাঝে নিজের স্থানীয় জামায়াতের সদস্যবর্গের যোগ্যতা এবং নিজের জামায়াতের উপায়-উপকরণ ও শক্তিসামর্থের পূর্ণ পরিমাপ করে সে সম্পর্কে আমীরে জামায়াতকে অবহিত করানো উচিত যে, কোন্ কোন্ বিভাগে কাজ করার জন্য তাদের নিকট কি কি যোগ্যতাসম্পন্ন লোক রয়েছে এবং প্রতিটি জামায়াত ঐ কাজগুলো পরিচালনার জন্য কি কি উপকরণ সরবরাহ করতে পারে।

যেখানে জামায়াত নেই এবং একক সদস্য রয়েছেন, সেখানে জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ নকশাটি সম্মুখে রেখে নিজের উপায়-উপকরণের পরিমাপ করে আমাদেরকে জানাতে হবে যে, এ ব্যাপারে তিনি কি কাজ করতে পারেন অথবা কাজের কি উপাদান সরবরাহ করতে পারেন। উপরন্তু যারা জামায়াতে শামিল হননি কিন্তু এ কাজে সহানুভূতিসম্পন্ন ও আগ্রহশীল, তারাও যদি কোনো পর্যায়ে এতে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তারা কোন্ ধরনের এবং কতটুকু অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

এক. শিক্ষা ও অনুশীলন

প্রথমত, এখানে আমরা একটি শিক্ষায়তন এবং একটি ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন করতে চাচ্ছি। 'নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা' এবং 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' বই দুটোতে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে, মানব জীবনে পূর্ণাঙ্গ এবং সত্যিকার বিপ্লব সৃষ্টিকারী কোনো আন্দোলন তার মেজাজ ও চাহিদা অনুযায়ী মানুষকে ঢালাই এবং তৈরি করার জন্য একটি শিক্ষা ও ট্রেনিং ব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া কোনোদিন কামিয়াব হতে পারে না। এ চিরন্তন সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় সহযোগীর সঙ্গে পরামর্শ করে– যারা শিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল এবং এ ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতাও রাখেন– একটি শিক্ষায়তনের খসড়া তৈরি করা হয়।

এর বুনিয়াদী নীতি উল্লিখিত বই দুটিতে বিবৃত নীতির অনুরূপ। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তাকে বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গরূপে পেশ করার যোগ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এর মধ্যে অনেক রদবদল করতে হবে। যখন আমাদের

পরীক্ষা সাফল্য লাভ করবে এবং আমরা এর উপর নিশ্চিন্ত হতে পারবো, তখন ইনশাআল্লাহ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়মাবলী এবং পাঠ্য তালিকা দুটিই প্রকাশ করবো। তবু এর কিছুটা পরিচয় এখানে দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা সময়কে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করেছি ঃ

১। বুনিয়াদী

২। মাধ্যমিক

৩। উচ্চ

১। বুনিয়াদী শিক্ষায় আমাদের চেষ্টা হবে মুসলমান হিসেবে দুনিয়ার কাজ চালাবার জন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য যেসব জ্ঞান, নৈতিক গুণাবলী এবং মানসিক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার প্রয়োজন, তার সবটুকু শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে একত্র করে দেয়া। আমরা তাকে শুধু বই পড়াবো না, আমাদের শিক্ষক কার্যত তাকে নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতার সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার ট্রেনিংও দেবেন এবং তাকে এমনভাবে গড়ে তুলবেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা পর্যায় অতিক্রম করে বাইরে বের হবার পর জীবনের প্রতিটি বিভাগে সে একজন উন্নতমানের কর্মী হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে।

তার মানসিক ও দৈহিক শক্তিগুলোর মধ্যে এমন একটি শক্তিও থাকবে না যাকে ব্যবহার করার পদ্ধতি তার জানা থাকবে না এবং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে একটি পথও এমন থাকবে না যার উপর দিয়ে চলার জন্য কমছে কম প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী তার কাছে থাকবে না।

এছাড়াও আমরা তাকে এতটুকু আরবী শিখিয়ে দেবো যার ফলে সে কুরআনের সহজ অর্থ নিজেই বুঝতে পারবো। উপরন্তু শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা তাকে ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে শুধু অবহিতই করবো না বরং কার্যত এর অনুসারীও করবো।

সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য এ শিক্ষা হবে একই রকমের। কেননা, আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক এ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিটি ছেলেমেয়ের লাভ করা উচিত। পরে তারা দুনিয়ায় কৃষক মজুর, প্রশাসক অথবা অধ্যাপক হিসেবে কাজ করুক তাতে কিছু আসে-যায় না।

২। মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ নির্ভর করবে ছেলেদের বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফলের উপর। বুনিয়াদী শিক্ষার শেষ স্তরে পৌঁছবার পূর্বেই প্রতিটি ছেলে সম্পর্কে আন্দাজ

করে নেয়া হবে যে, সে দুনিয়ার জীবনে প্রাথমিক কর্মীর চাইতে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা।

যেসব ছাত্র সম্পর্কে শিক্ষকদের আন্দাজ এবং পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে জানা যাবে যে, তারা ঐ পর্যায়ের শক্তি রাখে শুধুমাত্র তাদেরকেই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার দেয়া হবে। এ পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য হবে ছেলেমেদেরকে সেই সব কাজের জন্য তৈরি করা যাতে দৈহিক শক্তির তুলনায় বুদ্ধির প্রয়োজন অধিক। এখানে প্রতিটি ছেলের মানসিক গঠনের সাথে সংগতি রেখে তার জন্য পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত করা হবে।

জীবনের যে বিভাগের জন্য তাকে তৈরি করতে হবে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উচ্চ বিদ্যার প্রারম্ভিক পাঠ তাকে দেয়া হবে। কিন্তু এ শিক্ষা এমন পদ্ধতিতে দেয়া হবে যে, প্রত্যেক পার্থিব বিদ্যার মধ্যে দীনী দৃষ্টিভঙ্গি প্রাণপ্রবাহের মতো সঞ্চরণশীল থাকবে। বিদ্যার দ্বারা বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ নেবার পুরোপুরি অভ্যাস করানো হবে এবং ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তার মধ্যে একজন সত্যিকার মুসলমানের চরিত্রও সৃষ্টি করা হবে।

৩। উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাটি হবে একেবারে বিশেষ ধরনের। এতে আমাদের লক্ষ্য হবে এমন সব আলেম ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা, যারা জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন এবং যাদের মধ্যে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে একটি গোটা তমদ্দুন সৃষ্টি ও গঠন করার এবং একটি আধুনিকতম রাষ্ট্রের সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে।

এ কাজের জন্য যে ধরনের বিদ্যা, ইজতিহাদী শক্তি এবং আল্লাহ ভীতির প্রয়োজন, তা শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ফলাফল বিচার করে যেসব ছাত্রের বুদ্ধিগত এবং নৈতিক যোগ্যতা উচ্চ পর্যায়ের উপযোগী বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে শুধু তাদেরকেই এ পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে।

দুই. তত্ত্ব-গবেষণা

তত্ত্ব-গবেষণা বিভাগ আসলে আমাদের আন্দোলনের মন ও মস্তিষ্কের পর্যায়ভুক্ত। এতদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের জন্য যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহের কাজ করে এসেছেন মাত্র এক ব্যক্তি। কিন্তু বলা বাহুল্য, মাত্র একজন লোক এহেন একটি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন আন্দোলনের জন্য তত্ত্ব ও চিন্তার বুনিয়াদ সরবরাহ করার কাজ সম্পাদন করতে পারেন না।

সত্যিই যদি আমরা তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থায় কোনো বিপ্লবের প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে আমাদের শুধু উর্দু ভাষায় নয়, বরং দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এবং বিশেষ করে দু-তিনটি আন্তর্জাতিক ভাষায়ও এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা আবশ্যক, যা দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামী ব্যবস্থার পূর্ণ রূপকে তুলে ধরবে এবং সমালোচনার মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে মানুষের মন-মগজে ইসলামী ব্যবস্থার সত্যতার উপর বিশ্বাস এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার আকাংখা সৃষ্টি করবে।

উপরন্তু আমাদের আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিদ্যা সংকলন করতে হবে। অনুরূপভাবে আধুনিক বিদ্যাগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ কাজ সম্পন্ন না করে আমরা কোনোক্রমেই আশা করতে পারি না যে, নিছক কোনো গণআন্দোলন অথবা সামরিক আন্দোলনের মাধ্যমে দুনিয়ার বর্তমান তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থায় সত্যিকার ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।

এ উদ্দেশ্যে আমাদের এমন চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকের প্রয়োজন, যারা এ গবেষণা কাজের যোগ্যতা রাখেন এবং জামায়াতের সংগঠন ও শৃংখলার মধ্য থেকে এ কাজ সম্পাদন করতে পারেন। অন্যদিকে আমাদের একটি ভালো লাইব্রেরীর প্রয়োজন এবং এই সঙ্গে এমন উপায়-উপকরণের বড় প্রয়োজন, যার মাধ্যমে আমরা এই দীনের খাদেমদের জীবিকার সংস্থান করতে পারি।

তিন. সাধারণ পর্যায়ে দাওয়াত

এ দুটো গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধারণ পর্যায়ে দাওয়াতের কাজও পূর্ণ শক্তিতে চালিয়ে যেতে চাই। আমাদের গঠনমূলক প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না এই সঙ্গে এর পেছনে একটি শক্তিশালী জনমতও সৃষ্টি হতে থাকে। উপরোক্ত গঠনমূলক কাজ ছাড়া যেমন কোন ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত করা ছাড়া কোনো বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব নয়।

আমাদের শুধু ভারতবর্ষে নয়, যথাসম্ভব দুনিয়ার প্রতিটি এলাকায় নিজেদের আওয়াজ পৌঁছাতে হবে। কেননা আজকের যুগে আন্তর্জাতিক জনমতের ব্যাপকতর সমর্থন ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি দেশেও সত্যিকার বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে না। কোটি কোটি মানুষের নিকট আমাদের পয়গাম পৌঁছাতে হবে। কোটি

কোটি মানুষকে কমপক্ষে এতটুকুন প্রভাবিত করতে হবে যাতে আমরা যে জিনিসটি নিয়ে অগ্রসর হয়েছি তাকে তারা সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে।

আমাদের নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন দানের জন্য লাখ লাখ মানুষকে প্রস্তুত করতে হবে এবং এমন বিপুলসংখ্যক প্রাণোৎসর্গকারী কর্মী তৈরি করতে হবে, যারা হবে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী এবং এ মহান উদ্দেশ্যের জন্য কোনো প্রকার বিপদ, ক্ষতি ও মুসিবত বরদাশত করতে দ্বিধা করবে না।

এ ধরনের 'আম দাওয়াত' শুরু করার জন্য প্রয়োজন হলো প্রথমত ক্ষুদ্রাকারে একটি সীমিত এলাকায় নমুনা স্বরূপ কিছু কাজ করা এবং কর্মীদের নৈতিক ও বাস্তব জ্ঞান দানের মাধ্যমে ঐ এলাকায় তাদের দ্বারা কিছু কাজ নেয়া। এতে করে ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে দাওয়াত সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হবে। এ প্রয়োজনের অনুভূতি প্রথম থেকেই আমাদের ছিল। কিন্তু গত এক বছরের জামায়াতী কাজের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা আমরা হাসিল করেছি, তার প্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বেই আমরা এ বিভাগের ভিত্তি স্থাপন করতে চাই।

সাধারণ পর্যায়ে দাওয়াত দান বিভাগে কাজ করার জন্য বাইরের সমস্ত জামায়াতকে নিজেদের সদস্যদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে আপাতত একজন দু'জন করে এ কাজের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নির্বাচন করা উচিত এবং তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেন্দ্রকে অবহিত করা উচিত, উপরন্তু এও জানিয়ে দেয়া দরকার যে, তারা কতটুকু সময়ের জন্য এখানে এসে থাকতে পারবেন, তাদের প্রয়োজন কতটুকু, তাদের উপর কোন প্রকার দায়িত্বের বোঝা রয়েছে কিনা এবং তারা নিজেরা অথবা স্থানীয় জামায়াতের সদস্যবর্গ তাদের প্রয়োজন কতটুকু পূরণ করতে পারেন।

এছাড়া আমাদের প্রয়োজন একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এবং একজন ইউনানী চিকিৎসকের। তারা নিছক আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজেদের শহরের ডাক্তারখানা বন্ধ করে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে বাস করবেন। ভালো-মন্দ টুকটাক করে যেভাবে চলে তার উপর তারা সানন্দে সন্তুষ্ট থাকবেন। পূর্ণ আল্লাহভীতি এবং খাঁটি মানবিক দরদের সঙ্গে তারা আশেপাশের এলাকার জনগণের চিকিৎসা করবেন এবং নিজেদের সৎ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে স্থান লাভ করবেন। জামায়াতে এই ধরনের যেসব হেকিম ও ডাক্তার আছেন– এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে যারা প্রস্তুত– তারা নিজেদের খায়েশ আমাদেরকে জানাবেন।

চার. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে এ জিনিসটির অভাব রয়েছে। এতবড় কাজের জন্য যে সামগ্রিক সাহায্যের প্রয়োজন, তা এখনো আমরা হাসিল করতে পারিনি এবং ভবিষ্যতে হাসিল হবার আশাও নেই। উপরন্তু যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এ সাহায্য হাসিল করা যায়, তাও আমরা গ্রহণ করতে পারি না এবং আমাদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যেসব লোকের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মিল নেই, তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য লাভের আশা করার অধিকারও আমাদের নেই।

কতিপয় নেক লোক আছেন, আমাদের আবেদন ছাড়াই নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে তারা কিছু কিছু সাহায্য পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু এ সাহায্য এতদিনকার সামগ্রিক কাজের জন্যই অপ্রচুর ছিল, কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের সামনে কাজের যে পরিকল্পনা আছে তার জন্য তা মোটেই যথেষ্ট হবে না। এতদিন পর্যন্ত যা কিছু কাজ হয়েছে, তা হয়েছে স্রেফ জামায়াতের বুক ডিপোর আমদানী মারফত এবং তার পরিমাণও এত বেশি নয় যে, তার উপর নির্ভর করে এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

বর্তমানে এ বিরাট কাজের জন্য যে উপায়-উপকরণের প্রয়োজন, দুটো পদ্ধতিতে তা হাসিল করা সম্ভবপর।

এক ঃ যে সমস্ত লোক জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছেন এবং যারা এর আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাদেরকে এ পথে আর্থিক তাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং ঐসব বাতিলপন্থীর নিকট থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যারা তাদের আদর্শের কর্তৃত্ব কায়েম করার অথবা রাখার জন্য প্রতিদিন কোটি কোটি পাউন্ড আগুনে নিক্ষেপ করছে।

বলা বাহুল্য, বাতিলপন্থীদের এ কুরবানীর তুলনায় হকপন্থীরা যদি কিছুই কুরবানী না করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, তাহলে প্রকৃতির আইন অনুযায়ী এটা একেবারেই অসম্ভব যে, বাতিলের মোকাবিলায় যে হকের উপর আমরা ঈমান এনেছি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা কামিয়াব হয়ে যাবো।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো এই যে, আমাদের জামায়াতের মধ্যে যে সমস্ত লোক কোনো শিল্প অথবা ব্যবসায়ে পটু, তারা এখানে এসে কাজ নিয়ে নিজেদের যোগ্যতা ব্যবহার করে অর্থোপার্জন করতে পারেন। এই অর্থের এক ভাগ তারা নিজেদের

উপর এবং অন্যভাগ নিজেদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যয় করতে পারেন।

এ উদ্দেশ্যেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে আমরা আমাদের কার্যসূচির একটা অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছি। এখানে বেশ যথেষ্ট পরিমাণ জমি আছে। এ জমি অত্যন্ত উর্বর। এখানে বিজলী আছে, বড় বড় বাজারও অনেক নিকটে। যুদ্ধ শুরু হওয়া সত্ত্বেও যাতায়াত ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এখনো পুরোমাত্রায় কার্যকরী আছে। সামান্য অথবা প্রচুর মূলধন নিয়ে এখানে বিভিন্ন কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে।

স্থানীয় জামায়াতসমূহের আমীরগণকে নিজেদের জামায়াতের মধ্যে অনুসন্ধান করে জানতে হবে যে, তাদের সহযোগীদের মধ্যে কে কোন ধরনের কাজের যোগ্যতা রাখেন এবং কতটুকুন উপকরণ তাদের হস্তগত হয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের রিপোর্ট পৌঁছে যাবার পর আমরা প্রত্যেককে তার অবস্থানুযায়ী পরামর্শ দেবো এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যতটুকুন সাহায্য পৌঁছানো সম্ভবপর তা তাদেরকে পৌঁছানো হবে।

১৩৬১ হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার অধিবেশনের কার্যবিবরণী

[আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃক লিখিত]

১৩৬১ হিজরীর শাওয়াল মাসের দ্বিতীয় সপ্তায় (১৯৪২, অক্টোবর) মজলিসে শূরার দ্বিতীয় অধিবেশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। কতিপয় মতবিরোধ দূর করাই ছিল এ অধিবেশনের আসল উদ্দেশ্য। এ মতবিরোধগুলো দুর্ভাগ্যবশত প্রাথমিক পর্যায়ে নাজুক অবস্থায় জামায়াতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। এগুলোর কারণে আশংকা দেখা দিয়েছিল বুঝিবা দীর্ঘ এক শতাব্দীকালের অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে দীনকে কায়েম করার যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তার পেছনে রেখে যাবে এমন এক নৈরাশ্যব্যঞ্জক প্রতিচ্ছবি যার ফলে এর ব্যর্থতা অন্যান্য আল্লাহর বান্দাদের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠা করার যাবতীয় প্রচেষ্টার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এ মতবিরোধগুলো দূর করার জন্য আমি যতবার চেষ্টা করেছি, ততবারই আমাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শুধু ব্যর্থতাই নয়, মতবিরোধ, মতবৈষম্য, সন্দেহ ও সংশয়ের বিষ নিকট ও দূরের সমস্ত আরকানের (সদস্য) মধ্যে সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এহেন পরিস্থিতিতে এসব ব্যাপারের মীমাংসায় আমাকে সাহায্য করার জন্য আমি শূরার সদস্যদের দিল্লীতে একত্র করলাম।

এ অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ শরীক ছিলেন ঃ মওলানা আবুল হাসান আলী, লাক্ষ্ণৌ; জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, ভূপাল; মওলানা সিবগাতুল্লাহ, উমরাবাদ, মাদ্রাজ; মওলানা হাকিম আবদুল্লাহ, রোহড়ি, হিসার; সাইয়েদ আবদুল আযীয, শারকী, জালিন্ধর; মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, লাহোর; কাযী হামিদুল্লাহ, শিয়ালকোট; আবদুল জব্বার গাযী, দিল্লী; মুহাম্মদ বিন উলুব্বী, কাকোরবী; মওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী, বেরিলী; মওলানা সাইয়েদ জাফর, কাপুরথলা; কমরুদ্দিন খান এবং জনাব আতাউল্লাহ, পটুয়াখালী।

চার-পাঁচ দিন আমরা এ কাজেই মশগুল রইলাম। প্রথমত আমি চাইলাম, বিবদমান বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে। যারা আমার অথবা আমার কাজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, তারা যেন গোপন পত্রালাপ, গোপন আলোচনা,

কানাকানি এবং গীবত পরিহার করে জামায়াতের সম্মুখে নিজেদের অসন্তোষের কারণ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। অতঃপর জামায়াত যদি তাদের বক্তব্যে নিশ্চিত হতে পারে, তাহলে আমাকে যেন নেতৃত্বের পদ থেকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু তারা এতে রাজি হলেন না। অবশেষে আমি জামায়াতের সম্মুখে তিনটি বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করলাম।

প্রথম ঃ আমি ইস্তফা দেবো এবং আমার স্থলে অন্য কাউকে নেতা নির্বাচন করা হবে।

দ্বিতীয় ঃ যদি এমন একজন লোক না পাওয়া যায়, তাহলে তিন-চার জনকে একযোগে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় ঃ আমরা জামায়াতের যে ব্যবস্থা কায়েম করেছি, তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং যারা এ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের খেদমত করার শপথ গ্রহণ করেছেন, তাদের সবাইকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে, যে যার উপর সন্তুষ্ট হতে পারবেন তার সঙ্গে মিলে কাজ করবেন এবং যারা অন্য কারোর উপর নিশ্চিন্ত নয়, তবে নিজের উপর নিশ্চিন্ত, তাদের নিজেদেরকেই কাজ করতে হবে। আর যারা অন্যের এবং নিজের সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে, তাদেরকে 'ইমাম মেহেদীর আগমনের' প্রতীক্ষা করতে হবে।

প্রথম প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখান করা হলো। কেননা, এ পর্যন্ত যারা জামায়াতে শামিল হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে একজনও এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। এমনকি বিরোধকারীরা নিজেরাও এ ব্যাপারে একমত ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখান করা হলো। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি নির্ভুল ছিল না এবং কার্যত আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য কল্যাণকর ও নয়।

অবশ্য তৃতীয় প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিরোধকারীদের মত ছিল এই যে, এটিকেই কার্যকর করা হোক। আমি নিজেও এদিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। কেননা এহেন বিভিন্ন মেজাজের লোকদের মজলিসে আমি কোনো কল্যাণ দেখছিলাম না, এরা সম্মিলন ও সংযুক্তি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না এবং যে সর্বনিম্ন গুণাবলী না থাকলে কেউ জামায়াতের কর্মী হতে পারে না; তাও এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু শূরার অধিকাংশ সদস্য এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, এভাবে জামায়াত ভেঙ্গে দিয়ে আমরা নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের খেদমত করার পরিবর্তে তার সঙ্গে শত্রুতা করবো এবং আমাদের এ কাজ সেই অবিচ্ছিন্ন নিষ্ক্রিয়তাকে অব্যাহত রাখার জন্য আর একটি প্রমাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে, যা

বালাকোটের বিষাদময় পরিণতির পর থেকে একশো বছর পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের উপর পরিব্যাপ্ত ছিল।

এ জন্য কতিপয় ব্যক্তির বিরোধের কারণে জামায়াত ভাঙ্গার পরিবর্তে কেনইবা ঐ ব্যক্তিরাই জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাবেন না যারা এক সাথে চলতে পারেন না! এ যুক্তি এত বেশি জোরদার ছিল যে, অবেশেষে এরই জয় হলো। বিরোধ-প্রভাবিত লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং রয়ে গেলেন মাত্র চারজন। এরা বিরোধের উপর অবিচল থেকে জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এদের নাম হলো ঃ

১। মওলানা মুহাম্মদ মন্‌যুর নোমানী, সম্পাদক আল-ফুরকান, বেরিলী।
২। মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর, খতীব, জামে মসজিদ, কাপুরথলা।
৩। জনাব কমরুদ্দিন খান, সাবেক নাযেমে জামায়াত।
৪। জনাব আতাউল্লাহ, পটুয়াখালী, বাংলা।

কিন্তু এরা পৃথক হয়ে যাবার পরও জামায়াতের সকল সদস্যকে বিরোধের যথার্থতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল করানো এবং এর পরও তারা আমার উপর আস্থা রাখেন কিনা, একথার জবাব তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে না শুনে আমি জামায়াতের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করা জায়েয মনে করলাম না। কাজেই যারা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, তারা আমার নিজের উপর এবং আমার কাজের উপর বিস্তারিতভাবে যে লিখিত আপত্তি উঠিয়েছিলেন, তা জামায়াতের সম্মুখে পেশ করে দিলাম এবং এই সঙ্গে এসব আপত্তির যে জবাব আমার নিকট ছিল, তাও বিবৃত করলাম।

অতঃপর রফিকদের নিকট আরয করলাম, যে উভয় দিক থেকে তাদেরকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করে স্বাধীনভাবে ফয়সালা করতে হবে যে, যে ব্যক্তিকে তারা এক বছর পূর্বে নিজেদের নেতা নির্বাচন করেছিলেন এখনো সে তাদের দৃষ্টিতে নেতা হবার যোগ্যতা রাখে কিনা। জামায়াতের পক্ষ থেকে এর ইতিবাচক জবাব মিললো।

(আমি দুঃখিত, এ আপত্তিসম্বলিত লিপি-যার সম্পর্ক শুধু আমার নিজের সঙ্গেই ছিল না বরং জামায়াত এবং আন্দোলনের সঙ্গেও ছিল– গোপনভাবে দেয়া হয়েছিল এবং এখনো পর্যন্ত এর লেখক একে গোপন রাখার উপরই জোর দিচ্ছেন। নয়তো আমি বিনা দ্বিধায় এটি এবং এর সঙ্গে নিজের জবাবও প্রকাশ করতাম।)

অতঃপর মজলিসে শূরা জামায়াতের সংগঠন ও ভবিষ্যত কর্মসূচি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোচনা করলো। এতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থিরীকৃত হলো ঃ

একঃ জামায়াতের সংগঠনের জন্য প্রথমে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও দাক্ষিণাত্যের যে বড় বড় হালকাগুলো গঠিত হয়েছিল এবং যেগুলোয় মওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী, জনাব আমীন আহসান ইসলাহী, মওলানা সাইয়েদ জাফর এবং মওলানা সিবগাতুল্লাহ্ প্রমুখকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে শুধু দাক্ষিণাত্য হালকা ছাড়া আর সবগুলো ভেঙ্গে দেয়া হলো। এখন থেকে ঐসব হালকার স্থানীয় জামায়াতের সম্পর্ক সরাসরি কেন্দ্রের সঙ্গে হবে। অবশ্য শুধু দাক্ষিণাত্যের জামায়াতগুলো মওলানা সিবগাতুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

দুইঃ সতর্কতা অবলম্বন করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এমন কিছু সংখ্যক লোক জামায়াতের ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে যাদের মানসিক, নৈতিক ও দীনী অবস্থা এ জামায়াতের সদস্যপদের উপযোগী নয়। এদের চিন্তার পরিশুদ্ধি এবং অবস্থা সংশোধনের জন্য একটি উপযুক্ত সময় (প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এটি নির্ধারিত করা যায়) নির্ধারণ করতে হবে এবং এ সময়ের মধ্যে তাদের সংশোধন করার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি তারা সংশোধিত না হতে পারেন, তাহলে তাদের নিকট দরখাস্ত করতে হবে– তারা যেন ততদিন পর্যন্ত জামায়াতের শৃংখলার বাইরে থাকেন যতদিন পর্যন্ত তারা কমপক্ষে এ জামায়াতের সদস্য পদ লাভের উপযোগী মানদণ্ডে উত্‌রে না যান। উপরন্তু ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তিকে ততক্ষণ জামায়াতে শামিল করা হবে না। যতক্ষণ না তিনি জামায়াতের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পুরোপুরি হৃদয়ংগম করেন এবং তার জীবনে কার্যত সুস্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়।

কাজের গতিধারা

(আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী কর্তৃক লিখিত)

জামায়াতে ইসলামীর কাজের ক্রমবর্ধমান গতিধারা জানার জন্য সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রায়ই অস্থিরতা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এ অস্থিরতা অনেকটা স্বাভাবিক। এতদিন পর্যন্ত আমি শুধু এই ভয়ে এটিকে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম যে, এমনিভাবে আমাদের কাজের মধ্যেও বুঝি প্রদর্শনেচ্ছা প্রবেশ করবে এবং আল্লাহর জন্য কাজ করার পরিবর্তে আমরা দুনিয়াকে দেখাবার জন্য কাজ করতে থাকবো। কিন্তু আজ শুধুমাত্র এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এর উল্লেখ করছি যে, যেসব রফিক কেন্দ্র থেকে দূরে আছেন এবং যারা জানেন না যে, কাজ কি গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তারা যেন নিরাশ না হয়ে পড়েন।

জামায়াতের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে সাতশোর মতো। বাইরের জামায়াতগুলোর পক্ষ থেকে এখনো পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি। এ জন্য নির্ভুল সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসল সংখ্যা এ আনুমানিক সংখ্যা হতে বেশিও হতে পারে।

সিন্ধু, বেলুচিস্তান, (উত্তর-পশ্চিম) সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা, বোম্বাই এবং মাধ্য ভারতীয় এলাকা এখনো আমাদের দাওয়াত থেকে অনেক দূরে। যেসব এলাকা এর প্রভাব বেশি করে গ্রহণ করেছে, সেগুলো হচ্ছে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এবং মাদ্রাজের এলাকা।

জামায়াতের বইপত্রের প্রচার এবং সদস্যদের নিকট থেকে কাজের রিপোর্ট থেকে যতদূর আন্দাজ করতে পেরেছি তাতে বলা যায়, গত দেড়-দু'বছরে আমরা প্রায় এক লক্ষ লোকের কাছে নিজেদের আওয়াজ পৌঁছিয়েছি এবং এদের মধ্য থেকে কমপক্ষে শতকরা দশভাগ আমাদের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়েছে।

অমুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ এখন শূন্য বলতে হবে। তবু এ ব্যাপারে যে সামান্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তার ফলাফল নৈরাশ্যব্যঞ্জক নয়। এ থেকে এতটুকু আন্দাজ তো অবশ্যি হয়ে গেছে যে, অমুসলমান জাতিগুলোর মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক জাতীয় বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়, তা ইনশাআল্লাহ আমাদের দাওয়াতের পথে কোনো বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। জনসাধারণ, গ্রামীণ অধিবাসী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যেও এখনো

তেমন ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করা হয়নি। এ ব্যাপারে আমি নিজেও এখনো প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছি এবং আরো কতিপয় রফিক স্ব স্ব স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করছেন। ইনশাআল্লাহ অতি শিগগিরই এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সাধারণের নিকট দাওয়াত পৌছাবার জন্য একটি উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সমর্থ হবো।

দাওয়াতের জন্য আমরা এতদিন পর্যন্ত শুধু উর্দু ভাষাকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং অন্যান্য ভাষায় বেশি কাজ করতে পারিনি। কিন্তু ইংরেজী, তুর্কী, হিন্দী, তামিল, তেলেগু এবং মলয়ালম ভাষায় লিটারেচার তৈরির প্রচেষ্টা কার্যত শুরু হয়ে গেছে এবং আল্লাহর মেহেরবানী হলে যুদ্ধ শেষে আমরা ভারতে এবং ভারতের বাইরে ঐ ভাষাগুলোর মাধ্যমে আমাদের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু করে দেবো।

সবচাইতে বড় কথা এবং অন্যান্য সমস্ত ফলাফল থেকে আমাদের নিকট বেশি মূল্যবান জিনিস হলো এই যে, এ দাওয়াতের প্রভাব যেখানে পড়েছে, সেখানেই সে মুর্দা-দিল মানুষদেরকে জিন্দা করে দিয়েছে এবং নিদ্রিত হৃদয়তন্ত্রীতে জাগরণীর সুর অনুরণিত করেছে। এর প্রথম পরিচয়েই মানুষ আত্ম পর্যালোচনায় লিপ্ত হয়েছে। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক এবং হক-বাতিলের পার্থক্য পূর্বেকার সীমিত ধর্মীয় চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে করার পরিবর্তে এখন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শুরু করা হয়েছে। ইতিপূর্বে দীনদারী সত্ত্বেও যা কিছু করা হতো এখন আর তা বরদাশত করা হয় না, বরং তার স্মৃতিও লজ্জা দিচ্ছে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে এ জিনিসটি কেমন, এ দৃষ্টিভঙ্গি যে কোন ব্যাপারে পূর্বে যাদের নিকট কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখন এটিই তাদের নিকট সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পূর্বে যে দীনী অনুভূতি এত বেশি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল যে, বড় বড় জিনিসও চোখে পড়তো না এখন তা এত তীব্র হয়েছে যে, ছোট ছোট জিনিসও চোখে পড়ে। আল্লাহর সম্মুখে দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিশ্বাস বর্তমানে অনুভূত হচ্ছে এবং এ অনুভূতি অনেক জীবনে সুস্পষ্ট পরিবর্তন সূচিত করেছে। লোক এখন এভাবে চিন্তা করছে যে, দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করছে আল্লাহর তুলাদন্ডে তার কোনো ওজন আছে কিনা অথবা এসব কিছু এমনি ব্যর্থ হবে। অতঃপর আল্লাহর মেহেরবানীতে যেখানেই অনুপ্রবেশ করেছে সেখানেই উদ্দেশ্যবিহীন জীবনকে উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং শুধু তাদের জীবনের উদ্দেশ্যকেই নয়, ঐ উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছুবার পথও তাদের দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত করেছে।

চিন্তার বিক্ষিপ্ততা বিদূরিত হচ্ছে। বাজে ও অনর্থক কাজ-কারবারের আগ্রহ থেকে মন আপনা-আপনি দূরে সরে যাচ্ছে। জীবনের আসল ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীই দৃষ্টিসম্মুখে ভেসে উঠছে। চিন্তা ও গবেষণা একটা সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করছে এবং একটি সোজা ও সরল রাজপথ বেয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সার কথা হলো এই যে, ইসলামের উন্নত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার জন্য যে প্রাথমিক বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন, তা বেশ সন্তোষজনক গতিতে সৃষ্টি হয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যা কিছু হওয়া উচিত ছিল, তার তুলনায় অনেক কম হয়েছে। কিন্তু এ কমতির অনুভূতি যদি কাউকে নিরাশ হয়ে বসে যাবার প্রেরণা যোগায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত। কেননা এ ধরনের অনুভূতি হামেশা শয়তানের ধোকার ফলেই সৃষ্টি হয় এবং যদি এ অনুভূতি তাকে যা কিছু হাসিল করা যায়নি তা হাসিল করার জন্য উস্কানি প্রদান করে, তাহলে তাকে আল্লাহর শুকুরগুযারী করা উচিত এবং যা কিছুর অভাব অনুভব করে তা পূরণ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের দোষ-ক্রটির সঙ্গে এ অভাবের যে সম্পর্ক রয়েছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট 'ইস্তেগফার করি এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি খেদমত করার সুযোগ ও সামর্থ দানের জন্যে দোয়া করি।' কিন্তু আসলে শুধু আমাদের দোষ-ক্রটিই এর একমাত্র কারণ নয় বরং আরো কতিপয় কারণ রয়েছে, যেগুলোর উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই।

দ্বারভাংগা সম্মেলন ঃ কার্যবিবরণী

(সাইয়েদ আবদুল আযীয শারকী সাহেব কর্তৃক লিখিত)

আগের ঘোষণা মোতাবেক ১৯৪৩ সালের ২১ ও ২২ অক্টোবর দ্বারভাংগায় উত্তর প্রদেশের পূর্ব এলাকা এবং বিহারের জামায়াত সদস্যদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ হাযির ছিলেন ঃ

কেন্দ্র থেকে মওলানা মওদূদী সাহেব (আমীরে জামায়াত) এবং সাইয়েদ আবদুল আযীয শারকী, লাহোর থেকে জনাব নসরুল্লাহ খান আযীয, সম্পাদক- মুসলমান, এলাহাবাদ থেকে ডাঃ নাযির আলী যায়েদী সাহেব, মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব এবং আবদুর রশীদ সাহেব, মীরসরাই থেকে মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও মওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, পাটনা থেকে মওলানা মসউদ আলম নদবী, তাকিউদ্দিন নোমানী সাহেব, হাফেয মুহাম্মদ উসমান সাহেব, ডাঃ নূরুল আইন সাহেব এবং ডা. গিয়াস উদ্দিন সাহেব, মুংগের থেকে ফজলুর রহমান সাহেব এবং দ্বারাভাংগা থেকে সাইয়েদ মুহাম্মদ হোসাইন জামেয়ী সাহেব।

সদস্যগণ ছাড়া জামায়াতের আট-দশজন হামদর্দ— সমর্থকও বিভিন্ন এলাকা থেকে এতে যোগ দেন।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার উদ্দেশ্যে সম্মেলনের জন্য দ্বারভাঙ্গার জনবসতি থেকে দেড়-দু'মাইল দূরে সব্জি ক্ষেতের মধ্যে একটি পৃথক স্থান বেছে নেয়া হয়। ২১শে অক্টোবর সকালে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তিলাওয়াতের পর জামায়াত সদস্যগণ পরস্পরের বিস্তারিত পরিচয় লাভ করেন। অতঃপর মওলানা মওদূদী উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেন ঃ

১. আন্দোলন বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে অবস্থান করছে?

২. কোন্ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে?

৩. আর্থিক অবস্থা কেমন?

৪. কোন্ পরিকল্পনানুসারে কাজকে অগ্রবর্তী করতে হবে?

৫. আমাদের আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যে কোন্ ধরনের পার্থক্য রয়েছে?

৬. আসল বৈপ্লবিক কার্যক্রমের পূর্বে কোন্ কোন্ ধরনের কাজ করা প্রয়োজন?

৭. কোন কোন জামায়াত সদস্যের মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর কারণ কি?

৮. কি কি ভুল বুঝার কারণে সীমিত কার্যসূচির দাবী করা হচ্ছে?

সমগ্র বক্তৃতাটি হুবহু এখানে নকল করা কঠিন, তবে জামায়াতকে পথ-নির্দেশ দেবার জন্য বক্তৃতাটির প্রয়োজনীয় অংশগুলো এখানে উল্লেখ করছি ঃ

"আমাদের আন্দোলন ক্রমোন্নতির কতিপয় স্তর অতিক্রম করে বর্তমানে এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিভিন্ন দল আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলগুলো তিন-চার বছর পূর্বে যে কথাটি উচ্চারণ করতে প্রস্তুত ছিল না আজ অধিকাংশ দল সেটিকেই নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে গণ্য করছে। কিন্তু এ জিনিসটা আমাদের জন্য যতই তৃপ্তিদায়ক হোক না কেন, এর উপর আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

কেননা, মুসলিম জামায়াতগুলো যত সহজে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে গ্রহণ করে নেয়, ততটা সহজে এর বিশেষ কর্মপদ্ধতি, দায়িত্ব এবং নৈতিক প্রয়োজনগুলো গ্রহণ করতে পারে না। বর্তমানে একটা আশংকাও আছে। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন হুজুগপ্রিয় দলগুলোর ক্রীড়নকে পরিণত না হয় এবং একে একটি উন্নত জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে দুনিয়ার সামনে পেশ করার পরিবর্তে হাস্যাস্পদ বস্তুতে পরিণত না করা হয়। কাজেই এখন এদিকেই জোর দিতে হবে যে, এ আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে কামিয়াব করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো তো দূরের কথা বরং নাম উচ্চারণ করার জন্যও উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট হবার প্রয়োজন।

এদিক দিয়ে চিন্তাধারা প্রচারের অভিযান এমন জোরেশোরে পরিচালনা করা উচিত যে, হুকুমাতে ইলাহিয়ার শ্লোগান দানকারী দলগুলো যেন ঈমানদারীর সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বগুলো গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং ঐ শ্লোগান মোতাবেক কাজ করতে প্রস্তুত হয়। অথবা যদি তারা অন্য কোনো পথে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে যেন জনগণকে প্রতারিত করা থেকে বিরত হয়।

আশংকার দ্বিতীয় দিকটা হলো এই যে, গত পঁচিশ তিরিশ বছর থেকে অত্যন্ত ভুল পথে মুসলমানরা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে আসছে। একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার ভিত্তিতে নিরেট কাজ করার এবং কোনো বিশেষ পরিকল্পনা (Plan) গ্রহণ করার পরিবর্তে তারা এমনি হৈ চৈ শুরু করে দেয়। এই ভ্রান্ত আন্দোলন পদ্ধতি নিষ্ক্রিয়তা এবং স্থবিরতা থেকে কিছু কম ক্ষতিকর নয়, অথচ এটিই বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন

করেছে। আমরা এটিকে নির্মূল করে দিতে চাই। আন্দোলনের কাজ চালাবার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা (Planning) তৈরি করার আগে আমাদের দাওয়াতকে হুজুগপ্রিয় জনগণের সম্মুখে পেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ভালো করে চিন্তা করুন, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি অবতরণ করছেন, সেখানে শত্রু দল কোথায় ব্যূহ রচনা করেছে, কিভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এবং এর মোকাবিলায় আপনাকে কোন্ ধরনের ব্যূহ রচনা করতে হবে, আপনার দুর্বল দিকগুলো কি? আপনার দলকে কোন্ দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়া উচিত? কোন্ দিক অগ্রসর হতে হবে এবং কত বেগে? সারকথা হলো এই যে, হুজুগে মেতে হৈচৈ করলে হবে না। এ জন্য দরকার একটি হুঁশিয়ার সেনাপতির সতর্ক-সজাগ দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা। এই সঙ্গে একটি আনুগত্য ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ দলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টারও প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান পর্যায়ে নাজুকতা বৃদ্ধির আরো একটা কারণ আছে। মৌলিক চিন্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা অনেকাংশে কামিয়াব হয়েছি। কিন্তু আমাদের এ চিন্তাধারা সম্পর্কে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনাকারীগণের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই এর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাকে পেশ করার মতো চরিত্র এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন একটি সুসংগঠিত দল এখনো আমরা জোগাড় করতে পারিনি। আমাদের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সামগ্রিক জীবনের যে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া উচিত, লোকেরা যখন আমাদের নিকট থেকে তা জানতে চায়, তখন আমরা তা পেশ করতে অপারগ হই। নিছক এ জন্যই যে, এই বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এক ব্যক্তির কাজ নয় বরং এ জন্য একটি চিন্তাশীল গবেষক দলের প্রয়োজন। তারা নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করতে থাকবেন।"

"আমাদের দাওয়াত গ্রহণকারীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার উজ্জ্বল ও অন্ধকার দুটো দিকই রয়েছে।" এর উজ্জ্বল দিকটি হলো এই যে, মুসলমানদের যে অংশটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সেটি সৎ ও কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন। আমাদের আহ্বানে যেসব লোক - نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ - বলে একত্র হচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা সুখকর নৈতিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ উজ্জ্বল দিকের পাশে অন্ধকার দিকটি হলো এই যে, জামায়াত সদস্যদের মধ্যে সবর, নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে গভীর সংযোগ এবং নিজেদের 'ভয়ংকর শপথ'-এর দায়িত্বানুভূতিতে স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা নীরব হয়ে যান। যদি অনবরত উদ্বুদ্ধ ও উত্তপ্ত করার সিলসিলা

জারি না থাকে অর্থাৎ যদি উদ্বুদ্ধকারী না থাকে এবং কোনো মজার কাজ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই বাতলিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে - انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ । এর অবস্থা সহজেই সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের সদস্যদের মধ্যে এ ধারণা পুরোপুরি কার্যকর নেই যে, চেতনা, জ্ঞান ও দায়ত্বানুভূতির সঙ্গে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য আদায় করার অর্থ হলো এই যে, মানুষ কোনো ব্যক্তি বা দলের নিকট শপথ করছে না এবং এ শপথের সঙ্গে মুসলমানের জীবনের যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়, তার জন্য কাজ করা সাক্ষ্যদানকারীর উপর ফরয হয়ে যায়।

আমাদের জামায়াতী ব্যবস্থার আর একটা অন্ধকারময় দিক হলো এই যে, আমাদের আনুগত্যের মধ্যে কমতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরন্তু জামায়াত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি এবং এখনো আমরা এমন লোক সংগ্রহ করতে পারিনি যারা স্থানীয় আমীরের কর্তব্য পুরোপুরি বোঝেন এবং স্থানীয় জামায়াতের সদস্যদের নিকট থেকে সঠিক পদ্ধতিতে কাজ আদায় করতে পারেন।"

"প্রতিবন্ধকগুলো বিশ্লেষণ করলে তিনটি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, আমাদের কর্মীর অত্যন্ত অভাব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উপায়-উপাদান অত্যন্ত সীমিত এবং যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনটন একে শূন্যের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক থেকেই এর উৎপত্তি অর্থাৎ গঠনমূলক কাজ করার জন্য জামায়াত যে গুটিকয় মানুষ সংগ্রহ করতে পেরেছে, তারা একেবারেই বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এবং তাদেরকে একত্র করার কোনো পথ নেই।

ভারতবর্ষের চার দেয়ালের মধ্যে কয়েকটি কলকজা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে একত্র করে জুড়ে দেয়ার কোনো পরিকল্পনা কার্যকর হচ্ছে না। এ জন্যই কেন্দ্রের চিন্তার 'পাওয়ার হাউস' পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারেনি এবং সক্রিয় কর্মতৎপরতার প্রয়োজনীয় যন্ত্রও যথানিয়মে ফিট করতে পারা যায়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, এ পরিস্থিতির কতিপয় কারণ আমাদের আওতা-বহির্ভূত কিন্তু জামায়াত পুরোপুরি এ দায়িত্বমুক্ত নয়।

আমাদের রফিকদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা অতি অল্প বরং শূন্যের স্তরে বলা যায়। লোকেরা এখন পর্যন্ত জীবনোদ্দেশ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করতে শেখেনি। আল্লাহর পথে খরচ করার প্রেরণা এখনো অনুপস্থিত। সম্ভবত অন্যান্য দলের মতো যদি চাঁদা দেবার আবেদন করে লোকদেরকে ধাক্কা দেয়া হয় এবং

ٱدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ — এর আওয়াজ বুলন্দ করা হয়, তাহলে হয়তো এ অভাব পূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু মানুষ বাইরের ধাক্কার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, আমরা এটা পছন্দ করি না। আমাদের আন্দোলনের বিশেষ মেজাজ চায় ভেতরের তাগিদে সব কিছু করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যেমন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাইরের তাগিদ ছাড়াই পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছায়, তেমনি জামায়াতকে তার জামায়াতী পাকস্থলী বাইতুলমালের ক্ষুধা নিজেই অনুভব করা উচিত। নয়তো জীবনের স্পন্দন বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকতে পারবে না।

এ কথা ঠিক যে, আমাদের সদস্যদের অধিকাংশের অবস্থাই আর্থিক দিক দিয়ে বেশী সচ্ছল নয়। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ দাওয়াতটি কখনো শুরুতে বেশী সচ্ছল লোকদের নিকট আবেদন জানায়নি। পূর্বেও বেশীর ভাগ সেইসব লোক এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। আসলে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণার সম্পর্ক পকেট ভারী হওয়ার সঙ্গে ততটা নয় যতটা দিলের সঙ্গে রয়েছে। এই দিলের সম্পর্কের মধ্যে কমতি মনে হচ্ছে।

তবু আর্থিক অবস্থা একেবারেই নৈরাশ্যজনক নয়। এই দুরবস্থার যুগেও কিছু না কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু বাইতুলমালের অবস্থা এমন নয় যে, এর উপর নির্ভর করে কোনো বড় কাজ শুরু করা যেতে পারে। যতগুলো গঠনমূলক পরিকল্পনা আমাদের নজরে ছিল সবগুলো মুলতবী করা হয়েছে। আয়ের সবচাইতে বড় উপায় ছিল বুক ডিপো। কিন্তু কাগজের দুর্মূল্য ও অভাবে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাহির থেকে সাহায্য হিসেবে বিনা প্রচেষ্টায় যেসব টাকা আসতো গত ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে তার মধ্যেও স্পষ্ট কমতি দেখা দিয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক রফিককে স্বস্থানে চিন্তা করা উচিত এবং তার দায়িত্ববোধের নিকট জিজ্ঞেস করা উচিত, এখন তার কর্তব্য কি।"

"অনেক সময় মনে হয় আমাদের সদস্যগণ নিজেদের আন্দোলন এবং অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন। অথচ এ পার্থক্যটাকে ভালভাবে বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে। আসলে এ আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণ আন্দোলনগুলোর মৌলিক বৈষম্য রয়েছে।

প্রথমত, এর সামনে রয়েছে সমগ্র জীবনের সমস্যা, জীবনের কোনো একটা অংশের নয়।

দ্বিতীয়ত, বাহির সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ভিতর নিয়েই এই আলোচনা চলে। প্রথম দিকটা সম্পর্কেই বলা চলে যে, আমাদের সম্মুখে এত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ

রয়েছে যা ইসলামী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনো আন্দোলনের সামনে নেই এবং আমরা অতটা তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবো না যতটা অন্যেরা করতে পারে। অতঃপর যেহেতু বাইরের তুলনায় ভেতরটা আমাদের নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু নিছক সংগঠন এবং নিছক একটি ক্ষুদ্র নিয়ন্ত্রিত কার্যসূচী অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করলে এবং জনগণকে কোনো এক দিকে লাগিয়ে দিলেই আমাদের কাজ চলে না।

জনসাধারণের মধ্যে গণআন্দোলন (Mass Movement) চালাবার আগেই আমাদের এমন লোক তৈরি করার চিন্তা করতে হবে, যারা হবেন উন্নততর ইসলামী চরিত্র বিশিষ্ট। তারা এমন উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধি-বিবেচনা রাখবেন, যার ফলে চিন্তা-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তারা সামষ্টিক নেতৃত্বের দায়িত্বও পালন করতে সক্ষম হবেন। এ জন্যই সাধারণের মধ্যে আন্দোলনকে পরিচিতি করার জন্য আমি তাড়াহুড়ো করছি না। বরং এখন আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হলো দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রভাবিত করা, তাদেরকে নাড়া দিয়ে তাদের মধ্য থেকে অধিকতর সৎলোকদেরকে বাছাই করার চেষ্টা করা- যারা পরবর্তীকালে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং তাহযীব-তামাদ্দুন গড়ে তুলতেও সক্ষম হবে।

এ কাজ যেহেতু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সম্পাদন করতে হবে এবং একটি সাধারণ আন্দোলনের মতো ত্বরিত আলোড়ন এর মধ্যে পরিদৃষ্ট হবে না, তাই শুধু আমাদের সমর্থক ও সমমনা লোকরাই নয়, আমাদের সদস্যগণ পর্যন্তও মনমরা হয়ে পড়েন। আমি চাই, জামায়াত সদস্যগণ কাজের এ নকশাটি ভালো করে বুঝে নিবেন এবং মনমরা না হয়ে নিজেদের শক্তি-সামর্থ কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন।

একথা ঠিক অগণিত মানুষকে এ নক্শা অনুযায়ী উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট করে গড়ে তোলা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। কিন্তু জনগণের সংস্কারের অপেক্ষায় আমাদের বৈপ্লবিক কার্যসূচিকে আমরা মুলতবি করতে চাই না। আমাদের নিকট বর্তমানে শুধু এই পরিকল্পনা রয়েছে যে, জনগণের নেতৃত্বদানের জন্য এমন একটি ক্ষুদ্র দল গঠন করা যার এক এক ব্যক্তি নিজের উন্নত চরিত্রের আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এক একটি এলাকার জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। তার ব্যক্তিত্ব জনগণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে এবং কোনো রকম কৃত্রিম প্রচেষ্টা ছাড়া একেবারে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জনগণের নেতৃত্বের পদ তার জন্য নির্ধারিত হবে। কিন্তু শুধু জনগণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলে চলবে না, এদ্বারা কাজ নেবার মতো বুদ্ধি-বিবেচনাও থাকা উচিত। যাতে করে ঐ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে জনগণের

শক্তি একত্র ও সুসংবদ্ধ হয়ে ইসলামী বিপ্লবের পথে ব্যয়িত হতে পারে। এটিই হলো একটি অবিচ্ছেদ্য, স্থায়ী এবং সর্বজনীন বিপ্লবের অপরিহার্য প্রাথমিক পর্যায়। ধৈর্যের সঙ্গে এ পর্যায়টি উত্তীর্ণ হতে হবে, নয়তো আন্দোলনের ধ্বংস অনিবার্য। যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়- অথচ এখন জনগণের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো স্থানীয় নেতৃবর্গ (Sub leaders) নেই, তা হলে তারা অবশ্যই বিপথে পরিচালিত হবে এবং নিজেদেরকে অযোগ্য লোকদের হাতে সোপর্দ করে দেবে।"

"গণআন্দোলন (Mass Movement) শুরু করার আগে কতিপয় গঠনমূলক কাজ করে নেয়া উচিত।"

এক ঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্যসূচির ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। কেননা আমাদের জীবদ্দশায় যে আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ জন্য আমাদের এখন থেকেই চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের স্থলে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো কাজ করার জন্য ভবিষ্যত বংশধরদের তৈরি করতে হবে।

দুই ঃ আমাদের এমন একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে- যারা জ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের প্রত্যেক দিক থেকে বর্তমান ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাবেন। কতিপয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হবেন, তারা প্রচলিত কুফরী রাজনীতির গলিত ও দুর্গন্ধময় চেহারাকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করে দেবেন। কতিপয় অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ হবেন, তারা প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো দেখাবেন। কতিপয় আইন বিশারদদের প্রয়োজন, তারা মানব রচিত আইনের অসম ব্যবস্থা ও ফয়সালাগুলো প্রকাশ করে দেবেন। কতিপয় নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, তারা বর্তমান যুগের মনস্তত্ত্ব-বিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের ত্রুটিগুলোর দিকে অংগুলি নির্দেশ করবেন।

এই সব নেতিবাচক ও ভাঙ্গার কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে এরা উল্লিখিত বিদ্যাগুলোকে নতুনভাবে লেখার ও পেশ করার মতো গঠনমূলক কাজেরও দায়িত্ব নেবেন। এই মুজতাহিদ চিন্তাবিদগণকে সাহায্য করার জন্য অবশ্যই সাহিত্যিক, গাল্পিক ও নাট্যকারদের একটি দল থাকা উচিত, তারা চিন্তার সংগ্রাম ক্ষেত্রে 'গেরিলা যুদ্ধ' করতে থাকবেন।

তিনঃ গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামী দৃষ্টিতে গণআন্দোলন পরিচালনার জন্য কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক দলকে শিক্ষা দান করতে হবে। বক্তা থেকে নিয়ে নীরব কর্মী পর্যন্ত একেবারে নতুন ধরনের কর্মী আমরা চাই। তাদের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আল্লাহভীতির অনুভূতি অনুপ্রবিষ্ট থাকবে।

এ তিনটি বিভাগে যে সর্বনিম্ন গঠনমূলক কাজের প্রয়োজন, তা সম্পাদনের আগে এ ধরনের কোনো কিছু আশা করা উচিত নয় যে, জনগণের মধ্যে বিপ্লবী দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য আমরা কোনো সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো।"

"কাজের এ নক্‌শাটি এখনো কেউ কেউ বুঝে ওঠেনি। গত বিশ-পঁচিশ বছর থেকে যেসব আন্দোলন চলে আসছিল মানুষের চোখ শুধু সেগুলোই প্রত্যক্ষ করেছে। এ জন্য পূর্বোল্লিখিত দিকসমূহে নিজেকে ও নিজের দলকে তৈরি করার ক্ষেত্রে যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ না করে মানুষ দেখতে চায়, চলতে চলতেই ক্ষণকালের মধ্যে কোনো কাজ সম্পাদিত হচ্ছে কিনা এবং যখন তা পরিচালিত হয় না, তখন তারা নৈরাশ্যের শিকার হতে থাকে।

অনেক জামায়াত সদস্য প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে অথবা পত্র মারফত আমার নিকট প্রশ্ন করেছেন, আমাদের কর্মসূচি কি এবং আমরা কি করবো? এই কর্মসূচির দাবী এবং তাদের করার জন্য কোনো কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি এই ধারণা পোষণ করার বুনিয়াদও হলো এই যে, আমাদের রফিকগণ এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি যে আন্দোলনের খেদমতের জন্য তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদেরকে পেশ করেছেন তার ধরন কি? আসলে মুসলমানদের মর্যাদা কি এবং তার দায়িত্ব কত বিরাট, একথা একবার যদি সে পুরোপুরি বুঝে নিতে পারে, তাহলে সে নিজেই জানতে পারবে তার সমগ্র জীবনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন কর্মসূচি রয়েছে, যাকে পূর্ণ দায়িত্ববোধের সঙ্গে কার্যকরী করলে সে এক লহমার জন্য ফুরসত পেতে পারে না।

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনেকগুলো দৈহিক ও মানসিক শক্তি দান করেছেন। জীবন যাপনের অনেক উপকরণ আমানত হিসেবে তার কাছে রেখেছেন। অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে তাকে আবদ্ধ করেছেন এবং এসব সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করছে এবং যে আমানতগুলো তিনি তাকে সোপর্দ করেছেন, সেগুলো কিভাবে খরচ করছে, এটিই আল্লাহর কাছে তার দায়িত্ব। প্রত্যেক মুসলমানের কর্মসূচিই হচ্ছে, এ বিরাট ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে সে কতদূর নিজের কর্তব্য সম্পাদন করছে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সফলকাম করার ক্ষেত্রে কতদূর সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, সবসময় এ হিসেব নিকেশ যাচাই পর্যালোচনা করতে থাকবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি নিজের কণ্ঠশক্তির হিসেব নেয় এবং অনবরত এই চেষ্টায় রত থাকে যে, আল্লাহ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্যে তাকে কণ্ঠশক্তি দান করেছিলেন, সে তা কতদূর পূর্ণ করছে এবং এ দানের সঙ্গে যে দায়িত্ব অর্পিত

হয়েছিল তা সম্পাদন করতে সে কতদূর সচেষ্ট রয়েছে, তাহলে সম্ভবত এ সম্পর্কিত কর্মসূচি থেকে সে এতটুকু অবসর পেতো না যে, এরপর অন্য কোনো কর্মসূচী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতে পারতো। অন্যান্য বেশুমার শক্তির দায়িত্বের অবস্থাও অনুরূপ।

যদি এই ছোট ছোট কাজগুলোকে কর্মসূচি হিসেবে আপনাদের সম্মুখে পেশ করি, তাহলে এর ফল এছাড়া আর কিছুই হবে না যে, যে বিরাট ও সর্বজনীন কর্মসূচির বিভিন্ন দিক রয়েছে এবং জীবনের প্রতি লহমায় যার উপর সক্রিয় থাকতে হবে, তা থেকে আপনারা গাফেল হয়ে যাবেন এবং মনে করবেন যে, এই ক্ষুদ্র কর্মসূচির মাধ্যমে যা কিছু পেশ করা হয়েছে তাই বুঝি আসল করণীয়। এ জন্য অনবরত কঠোর দাবী জানানো সত্ত্বেও আমি এ ধরনেরকোন কিছু পেশ করতে কঠোরভাবে বিরত থেকেছি এবং ভবিষ্যতেও বিরত থাকবো।

আমার চরম প্রচেষ্টা হলো ঃ সচেতন মুসলমান হবার পর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের জন্য যে কর্মসূচি নির্ধারিত হয়ে যায় জামায়াতের মধ্যে শামিল হয়ে সে যেন তা হৃদয়ংগম করে এবং তার উপর সক্রিয় থাকে। আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই যখন আমাদের রফিকদের মুখ থেকে এমনি কোনো প্রশ্ন শুনি যে, আমাদের করণীয় কি?

আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি নিজেদের সমস্ত দুর্বলতা দূর করে ফেলেছেন? আপনারা কি নিজেদের নফ্সকে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা বানাবার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছেন? আল্লাহ ও তাঁর দীনের পক্ষ থেকে আপনাদের মন-মগজের উপর, অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয়ের উপর, দৈহিক ও মানসিক শক্তির উপর এবং আপনাদের কব্জায় যেসব ধন-সম্পদ রয়েছে তার উপর যে সমস্ত 'হক' নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলো কি আপনারা আদায় করেছেন? আপনার আশেপাশে একটি লোকও কি আল্লাহ্ থেকে গাফেল, গোমরাহ, হক দীন সম্পর্কে অনবগত অথবা নৈতিক অধঃপতনের গর্তে পড়ে নেই? তাদের সংস্কারের দায়িত্ব কি আপনাদের উপর বর্তায় না?

যদি এমন না হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের মনে এ চিন্তা কোত্থেকে বাসা বাঁধলো যে, আপনাদের করণীয় আর কিছুই নেই এবং এখন করবার মতো কিছু কাজ আপনাদেরকে বাতলিয়ে দেয়া হোক? এসব কাজ তো অসম্পন্ন পড়ে রয়েছে। এগুলো আপনাদের গভীর মনোনিবেশ সাপেক্ষ। এগুলোকে যথার্থভাবে সম্পাদন করতে গেলে আপনারা এক মুহূর্তও অবসর পেতে পারেন না। কিন্তু বিগত জামানার হাল্কা আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি-পদ্ধতিতে যেহেতু আপনারা অভ্যস্ত এবং ইসলামী আন্দোলনের অনুভূতি আপনাদের মধ্যে পুরোপুরি জাগ্রত হয়নি,

তাই কর্মহীনতা এবং কর্মসূচি না থাকার অভিযোগ আপনাদের কণ্ঠ হতে শ্রুত হচ্ছে।

এসব অভিযোগ খতম করার একটি মাত্র পথ আমার নিকট আছে। কাজ ও কর্মসূচি বাতলাবার পরিবর্তে আমি শুধু আপনাদের দায়িত্ববোধ ও ইসলামী চেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবো। এরপর অশেষ কাজ ও চিরন্তন কর্মসূচির নক্‌শা আপনা আপনি আপনাদের দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ভাসিত হতে পারে।

"জামায়াত সদস্যদের পক্ষ থেকে বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়, কেন্দ্র থেকে অনবরত তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হোক এবং জামায়াতী কাজের ব্যাপারে তাদেরকে অনবরত নাড়া দেয়া হোক। এ পদ্ধতিটা আমি নির্ভুল মনে করি না। আমার চেষ্টা হলো এইঃ প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় জামায়াত পরিচালনার জন্য এমন লোক হওয়া উচিত যার মধ্যে থাকবে স্বতোৎসারিত কর্মশক্তি (Initiative), যে নিজেই নিজের কর্তব্য বুঝে নেবে এবং কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতাও রাখবে। নির্ধারিত কাজগুলোকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদনে অভ্যস্ত করতে আমি চাই না। আমার কাজ হলো নীতি ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয়া এবং নীতিগত নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া। এরপর জামায়াত সদস্যগণ এবং বিশেষ করে স্থানীয় জামায়াতের আমীরগণের নিজেদের কাজ বুঝে নেয়া এবং তা সম্পাদন করা উচিত। কোথাও কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হলে, জটিলতা দেখা দিলে অথবা নিজেদের হালকায় কোনো নয়া পরিকল্পনা কার্যকর করতে চাইলে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

হামেশা নির্দেশের অপেক্ষা করা, ধাক্কা, উস্কানি, তত্ত্বাবধান এবং জবাবদিহির প্রতীক্ষায় থাকা-এসব প্রক্রিয়া কোনো আন্দোলন পরিচালনার কল্যাণকর পদ্ধতি নয়। কেননা এর ফলে এ পথে চলার জন্য লোকেরা স্থায়ীভাবে কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও নির্দেশ দানকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে এবং যদি কোনো সময় ঐ ব্যক্তি সরে যায়, তাহলে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। কমপক্ষে আমাদের প্রাথমিক কর্মীগণ যারা 'সাবেকুনাল আওয়ালুন'- প্রথমে আসার কারণে অগ্রবর্তী হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ গুণাবলী থাকা উচিত যে, কেউ যদি এ পথে না চলে, তাহলে তিনি নিজেই চলবেন। যদি কেউ উদ্বুদ্ধকারী না থাকে, তাহলে তিনি নিজেই উদ্বুদ্ধ হবেন বরং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করবেন।

আজকাল সাধারণত সমাজের যত্রতত্র যেসব বিভ্রান্তির খোঁজ পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, মানুষের মধ্যে অনেক বিশেষ ধরনের কাজের গুরুত্বের আনুপাতিক ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে কারণে দাবী করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি

শুধু ঐ বিশেষ ধরনের কাজই করবে এবং 'কাজ' শব্দটির অর্থও এই নেয়া হয় যে, দুনিয়ায় ঐটিই একমাত্র কাজ রয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামদেশ ভ্রমণ করা এবং জনগণের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণ ইত্যাদি। কোনো লোকের গ্রামবাসীদের মধ্যে বক্তৃতা করা এবং জনগণের মধ্যে কুসংস্কার নির্মূল অভিযান চালাবার যোগ্যতা থাক বা না থাক সেদিকে নজর দেয়া হবে না। মানুষ চায়, কেউ যদি কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে এ কাজটিই করুক। এর মোকাবিলায় অন্যান্য কাজ যেগুলো ওজন ও ফলাফলের দিক দিয়ে গ্রামবাসীদের সংস্কার সাধন এবং জনগণের মধ্যে দাওয়াত দেয়া থেকে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং বিরাট ও মহান কাজ সেগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় না।

আমি দেখছি আমাদের রফিকগণও অনেকটা এ ভ্রান্ত কর্মনীতি দ্বারা প্রভাবিত এবং অনেকের মধ্যে নিজের যোগ্যতার পরিমাপ না করে আন্দাজেই এমন কাজ করে যাবার মনোভাব দেখা যাচ্ছে, যার সঙ্গে কাজের শুধু শাব্দিক যোগ আছে। এ ভুলটাকে ভালো করে বুঝে নিন এবং এর গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আসলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ইবাদতের যে যোগ্যতা আমানত রেখেছেন, তা তিনি সবার কাছে দাবী করেন। আল্লাহ কোনো মানুষকে যে সমস্ত শক্তি সোপর্দ করেছেন তার সমস্তটা দিয়ে তাঁর ইবাদত করা উচিত এবং কাউকে যে বিশেষ শক্তি বেশী করে দান করেছেন, অন্যান্য শক্তির তুলনায় তার উপর ইবাদতের হকটাও বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা বলার শক্তি বেশী করে দিয়ে থাকেন, তাহলে তার কণ্ঠকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার কাজে নিয়োজিত করাই হবে তার জন্য আসল ইবাদত। আর যাকে লেখনী শক্তির সুস্পষ্ট যোগ্যতা দান করা হয়েছে, তার লেখনীর উপরই সবচাইতে বেশী ইবাদতের দায়িত্ব অর্পিত হবে। মোট কথা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ যে বিশেষ শক্তি দান করেছেন, তাকে কাজে লাগানোই হবে তার প্রধান দায়িত্ব। যদি এ কাজ ছেড়ে সে এমন কোনো কাজে নিজের শক্তি ব্যয় করে, যার যোগ্যতা তার মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম, তাহলে সে পুরস্কারের হকদার হবে না।

আল্লাহর দীনের খেদমত করার যখন অসংখ্য দিক রয়েছে এবং প্রত্যেকটা দিকের একটা গুরুত্ব রয়েছে, তখন ব্যক্তির প্রচেষ্টাকে কোনো একটি পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা কোনক্রমেই ঠিক নয়। শিক্ষকতার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক, লেখক, সাংবাদিক সবাইকে গ্রামে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেবো, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ধ্বজাধারীরা এমন একটি পরীক্ষা প্রথমাবস্থায় রাশিয়ায় করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীদের একটি বিরাট দলকে তারা কৃষক-মজুরদের

মধ্যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বহু লোকের জীবনকে অপাত্রে ব্যয় করার পর জানা গেল যে, এসব ভুল হয়ে গেছে। এই নাজুক বুদ্ধিজীবীগণ গ্রামবাসীদেরকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে পারেননি এবং অন্য খেদমত থেকেও এরা বঞ্চিত থাকেন। আমাদের এ ধরনের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির হিম্মত নেই।

এ কথার অর্থ এ নয় যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে কাজ করা হবে না অথবা জনগণের সংস্কার সাধনের কোনো গুরুত্ব নেই। যারা এ কাজের যোগ্যতা রাখেন, তারা অবশ্যই এ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং জনগণকে নিজেদের সঙ্গে টেনে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন। আমাদের কতিপয় সদস্য আগে থেকেই জনগণের মধ্যে আন্দোলন সম্প্রসারণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অন্য স্থানেও এ অভিযান শুরু করা উচিত।

কিন্তু যারা গ্রামবাসী এবং সাধারণ মানুষের মানসিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাদেরকে বুঝার যোগ্যতা রাখেন না উপরন্তু বুদ্ধিজীবী সমাজকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা রাখেন, তাদেরকে নিজেদের শক্তি ঐ বুদ্ধিজীবি মাজের সংস্কারে ব্যয় করা উচিত। আসলে ঐ সমাজের এক ব্যক্তির সংশোধন সাধারণ জন-সমাজের হাজার জনের সংশোধনের চাইতেও বেশী ভারী। জ্ঞান ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দীনের খেদমত করার যোগ্যতা যারা রাখেন, তারা যদি এ কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রাম ভ্রমণে বের হন এবং মজুরদের বস্তির মধ্যে ঘুরাফিরা করতে থাকেন, তাহলে তারা নিজেদের উপর এবং নিজেদের জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের উপর জুলুম করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের যোগ্যতা বুঝে সেই মোতাবেক নিজের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে নেয়া উচিত। এভাবে প্রত্যেকটি দিককে শক্তিশালী করে আমরা সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবো।"

এ বক্তৃতার পর বিভিন্ন স্থানের জামায়াতের প্রতিনিধিগণ নিজেদের হালকার রিপোর্ট পেশ করেন এবং সেখানে এ পর্যন্ত কি কাজ হয়েছে, কোন্ ধরনের লোক জামায়াতে শামিল হয়েছে, স্থানীয় জনগণের মধ্যে আমাদের দাওয়াতের প্রভাব কতটুকু, দাওয়াতের অগ্রগতির পথে কোন্ কোন্ ধরনের বাধা-বিপত্তি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দাওয়াত দেবার জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেন।

এ সিলসিলা চলাকালেই প্রথম অধিবেশন শেষ হলো।

দ্বিতীয় অধিবেশন একই দিন যোহরের পর শুরু হলো। এতেও প্রথম দিকে বেশ কিছুটা সময় অবশিষ্ট রিপোর্ট পড়ার কাজে ব্যয় হলো। অতঃপর এ রিপোর্টগুলোর উপর আলোচনা ও মন্তব্য শুরু হলো। জামায়াতের ব্যবস্থায় যেসব দুর্বলতা দেখা

গেল আমীরে জামায়াত সেগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার সংশোধনের জন্য পথনির্দেশ দিলেন। যেমন কোন কোন স্থানে অপ্রিয় অথবা কাঁচা লোকদেরকে অসতর্কভাবে জামায়াতে শামিল করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এভাবে যেসব লোক আন্দোলনকে ভালোভাবে না বুঝে জামায়াতে শামিল হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট নৈতিক পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হচ্ছে না, তাদেরকে পোখতা করার চেষ্টা করতে হবে এবং এরপরও যাদের মধ্যে গলদ রয়ে যাবে, তাদের নিকট আবেদন জানাতে হবে যে, জামায়াতের শৃংখলার বাইরে থেকে তারা যাবতীয় সম্ভাব্য পদ্ধতিতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন।

এছাড়াও ভবিষ্যতে কেবল তাদেরকেই জামায়াতে শামিল করা হবে, যারা জামায়াতের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে, যারা গঠনতন্ত্রের প্রাণবস্তুকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং যাদের নৈতিক মূল্যবোধ ও চরিত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনুরূপভাবে দাওয়াতের পদ্ধতির মধ্যে যেখানে কোন দুর্বলতা দেখা যাচ্ছিল আমীরে জামায়াত তার সমালোচনা করে বিস্তারিতভাবে দাওয়াতের নির্ভুল পদ্ধতি এবং তার পথে বিবৃত বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি দূর করার পন্থা বাতলিয়ে দিলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি নির্দেশ দিলেন, জনগণের মধ্যে আপাতত শুধু দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং দীনের আসল অর্থের প্রচার করা হোক। শেষ ও চরম দাবী পেশ করার ব্যাপারে এখন সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বর্তমানে তাওহীদ, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের দাওয়াত এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর সামনে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য প্রচারকার্য চালাবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত। দাওয়াতের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা উচিত যেন আহ্বায়ক নিজেকে কোনো জামায়াতের বিশেষ শৃংখলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মুবাল্লিগ হিসেবে পেশ না করেন এবং নিজের বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্যে যেন জামায়াতের সংগঠনের দিকে মানুষকে সাধারণভাবে দাওয়াত না দেন।

শিক্ষিত সমাজে যারা কাজ করেন, তাদের বিতর্ক ও আলোচনার পরিবর্তে বইপত্র পড়ানোর কাজে সময় ব্যয় করা উচিত। যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন তার মানসিকতাকে সামনে রেখেই জামায়াতের লিটারেচার থেকে বিশেষ বিশেষ বই নিয়ম মাফিক তাকে পড়ান। এরপর যেসব ব্যাপারে আরো বুঝার বাকী থাকে সেগুলো সম্পর্কে মুখে মুখে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে আলোচনা বিতর্কের দিকে মোড় নিচ্ছে বলে অনুমিত হয়, সেখানেই থেমে যাওয়া উচিত এবং নিজেকে বুদ্ধির লড়াইয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো উচিত। যেসব লোক অন্যান্য দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অথবা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসে আপাদমস্তক

নিমজ্জিত রয়েছেন, তাদেরকে খামাখা টেনে আনা এবং যেসব বিতর্ক তাদের মধ্যে জিদের ভাব সৃষ্টি করে তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা উচিত।

কোথাও বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা থাকলে দেখে নেয়া উচিত যে, সেগুলোর মূল কোথায়? কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে অথবা আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে জেনে নেবার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কি এ বিরোধিতা করা হচ্ছে? যদি প্রথমটা হয়, তাহলে যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করা উচিত এবং যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে সবর করা উচিত।

এই জরুরী নির্দেশাবলীর শেষাংশে আমীরে জামায়াত রফিকদের বলেন- "যে কথা আমি বিশেষভাবে আপনাদের জানাতে চাই, তাহলো এই যে, তাবলীগ শুধু বক্তৃতা, আলোচনা অথবা লেখার মাধ্যমে হয় না, বরং আসল তাবলীগ হলো একটি বিশেষ চিন্তাধারার আহ্বায়ক নিজের সমগ্র জীবন পরিসরে প্রতি মূহূর্তে যা করে থাকেন তাই। তবে শর্ত হলো এই যে, তার জীবন যদি সেই চিন্তাদর্শের মূর্ত প্রকাশস্থল এবং তার জ্বলন্ত সাক্ষ্যে পরিণত হয়। আপনি যে মতাদর্শের আহ্বায়ক যদি তার ছাঁচে আপনার জীবন পুরোপুরি ঢালাই হয়, তাহলে ঐ মতাদর্শের উল্টো পথে ধাবমান দুনিয়ায় আপনার অবস্থা হবে ঠিক তেমনি, যেমন একটি গোলাকার গর্তের মধ্যে একটি চতুষ্কোণ পেরেক যা তার সমগ্র সত্তা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি কোণ্ থেকে ঐ গোলাকার গর্তের সমগ্র সত্তার সঙ্গে সংগ্রামমুখর থাকে এবং প্রতি লহমায় তার এবং ঐ গর্তের বিরোধের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথবা যেমন বরফগৃহের মধ্যে কতিপয় জ্বলন্ত অংগার- তারা যদিও কোনো আওয়াজ বুলন্দ করে না, তবু তাদের কেবলমাত্র ওখানে থাকাটাই হলো বরফের চাঁইগুলোর বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা। তাদের আশেপাশে যদি কোনো অগ্নিদাহ্য পদার্থ থাকে, তাহলে কোনো বক্তৃতা ছাড়াই সে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্বলে উঠবে এবং বরফঘর অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়ে যাবে।

চেতনাহীন ইসলাম ও মুনাফেকীর ইসলাম-এর ব্যাপার তো হলো ভিন্ন। কিন্তু যখন কোনো লোক নৈতিক সাহসের সঙ্গে সচেতনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন সেই সঙ্গেই চিন্তাধারা, নৈতিকতা, অর্থনীতি, সামাজিকতা, তমদ্দুন-এক কথায় জীবনের প্রতিটি বিভাগেই নিজের অনৈসলামী পরিবেশের সঙ্গে তার সংগ্রাম শুরু হয়। সে এই পরিবেশের চোখে এবং এই পরিবেশ তার চোখে হামেশা কাঁটার মতো বেঁধে। তার সমগ্র সত্তা জাহেলিয়াতের পরিবেশের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদের রূপ নেয়। এ পরিবেশে সে যেন একজন অপরিচিত আগন্তুক পরিণত হয় ঠিক যেন কালো চাদরের উপর সাদা দাগের মতো।

এই কুফর ও জাহিলিয়াতপিষ্ট পরিবেশে আপনারাও এই পর্যায়ে উপনীত হোন, এটিই আমার কাম্য। এতে করে নিজের জীবনের প্রতি লহমায় এই ব্যবস্থার প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে আপনারা সংঘর্ষ বাধাবেন এবং নিজেদের সমগ্র সত্তা দিয়ে এর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন এবং একটি চিরন্তন প্রতিবাদে পরিণত হবেন। এই প্রতি মুহূর্তের ও প্রতি দিকের সংঘর্ষ এবং প্রতি লহমার নীরব সংগ্রাম সহস্র ওয়ায-নসিহত, বক্তৃতা ও প্রবন্ধের চাইতেও বেশী ভারী। বরং আসল জিনিস হলো এটি এবং এছাড়া চিন্তাধারা প্রচারের অভিযান কামিয়াব হতে পারে না।"

এই গভীর তত্ত্বপূর্ণ পরামর্শগুলোর পর তিনি রফিকদের একটি বড় এবং সাধারণ দুর্বলতা সুস্পষ্ট করে বলেন ঃ আমি অনুভব করেছি, বিভিন্ন দল থেকে আগত লোকেরা পূর্বের দলীয় ও রাজনৈতিক জীবনের চিহ্নগুলো সঙ্গে করে এনেছেন। তাদের মধ্যে এখনো আগের দলীয় বিদ্বেষের প্রভাব সক্রিয় রয়েছে। যেমন, যারা কংগ্রেস ছেড়ে এসেছেন, তারা যদিও এখন কংগ্রেসের সমর্থনের মনোভাব রাখেন না, কিন্তু লীগ বিরোধিতার মনোভাব তাদের মস্তিষ্কে পুরোমাত্রায় সক্রিয় রয়েছে। এই একই অবস্থা লীগ থেকে যারা এসেছেন তাদেরও। আবার যারা বিশেষ ধর্মীয় দল ছেড়ে এসেছেন তাদের মধ্যেও ঐ সব দলের বিরুদ্ধে বেশ অনেকটা বিরোধী মনোভাব জমাট বেঁধে আছে- যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা সারা জীবন কাটিয়েছেন। এই বিভিন্ন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন লোকেরা যখন এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন, তখন অনেক সময় আশংকা হতে থাকে যে, বুঝিবা তাদের আলোচনা অতীত বিদ্বেষগুলোকে আবার তেমনিভাবে জাগিয়ে তুলবে যেমন আওস ও খাযরাজ বংশের লোকদের মধ্যে মুনাফিকদের নিক্ষিপ্ত একটা তিক্ত কথা যুগাস যুদ্ধের ঘটনাবলীকে পুনর্বার জাগিয়ে তুলেছিল।

এ মন্তব্যের সিলসিলা তৃতীয় অধিবেশন পর্যন্ত জারি রইলো। এরপর তৃতীয় অধিবেশনে প্রদেশের কাজের সংগঠন সম্পর্কে পরামর্শ হলো। পরামর্শকালে বুঝা গেল যে, বিহার প্রদেশে জামায়াতের একজন কাইয়েম (জেনারেল সেক্রেটারী) নিযুক্ত করার অত্যধিক প্রয়োজন। এমন একজন কাইয়েম যিনি হবেন কর্মঠ, কর্তব্য সচেতন, বিভিন্ন স্থানীয় জামায়াত ও একক রুকনদের (সদস্য) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন, তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবেন, মাঝে মাঝে তাদেরকে একত্র করতে থাকবেন এবং কখনো কখনো নিজেও তাদের নিকট পৌঁছে যাবেন। এ কাজের জন্য মওলানা মাসউদ আলম নদবী সাহেবই যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর স্বাস্থ্য এর অনুমতি দিচ্ছিল না। এ জন্য ফয়সালা হলো, বিহার জামায়াতের রুকনগণ যথাশীঘ্র নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একজন কাইয়েম জামায়াত নির্বাচিত করবেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি সম্পর্কে অন্যান্য স্থানীয় জামায়াতের আমীরদেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা হলো, নিজেদের হালকার রুকনদের যোগ্যতার সঠিক পরিমাপ করে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেক জুময়ায় অবশ্যই বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব লোক কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বৈঠকে হাজির থাকবেন না, তাদের সম্পর্কে ধরে নেয়া উচিত যে, তারা জামায়াতের ব্যাপারে আগ্রহশীল নন। জুময়ার বৈঠকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবেঃ

১। জামায়াত প্রকাশিত বইপত্র পাঠ করতে হবে। শুধু সদ্য প্রকাশিত বই-পত্রই নয়, পুরাতনগুলোও। এতে করে এ সবের বিষয়গুলো পুনরায় মনে নতুনভাবে দোলা দেবে। বিশেষ করে গঠনতন্ত্র মাঝে মাঝে জামায়াতের সভায় পাঠ করা উচিত।

২। পিছিয়ে পড়া রফিকদের উঠাবার, তাদেরকে উৎসাহ দেবার এবং দরদ সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

৩। বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াত সম্প্রসারণের উপায় চিন্তা করা উচিত।

৪। প্রত্যেকের গত সপ্তাহের কাজের রিপোর্ট পেশ করতে হবে। অন্যান্য সদস্যগণ তার রিপোর্ট থেকে উপকৃত হবেন, তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোন গলদ থাকলে তাতে সংশোধনী দেবেন অথবা তার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা সৃষ্টি হলে তার সমাধান তালাশ করবেন।

৫। দাওয়াতের পথে যেসব বাধার সৃষ্টি হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

৬। স্থানীয় জামায়াতে কারোর দরসে কুরআন দেবার যোগ্যতা থাকলে তিনি সাপ্তাহিক দরস দেবেন। অন্যথায় তাফহীমুল কুরআনের সাহায্যে কুরআন মজীদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

মনে রাখা উচিত, এই সাপ্তাহিক বৈঠক কোন সাধারণ জিনিস নয়। রুকনদেরকে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাখা, তাদের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবকে স্থায়ী করার জন্য এটি বৃহত্তম মাধ্যম। এথেকে গাফেল হলেই জামায়াতের কাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আন্দোলন সম্পর্কে কে সত্যিকার আগ্রহশীল এবং কে আগ্রহশীল নয়, একথা জানবার কোনো উপায়ই আমাদের থাকবে না। আমাদের রুকনগণ পরস্পরের সঙ্গে অপরিচিতই থেকে যাবেন। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ সম্পর্ক শক্তিশালী হবে না। তারা

জামায়াতের কাজে সহযোগিতা করতে পারবে না। তারা পরস্পরের সংস্কারের ক্ষেত্রে সাহায্যও করতে পারবে না।

তৃতীয় যে জিনিসটির দিকে আমীরে জামায়াত রফিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হলো ঃ তাদেরকে নিজের শপথের দায়িত্ব বুঝবার এবং তা আদায় করবার চিন্তা করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের শক্তি ও যোগ্যতার পূর্ণ পরিমাপ করে সে কি কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। অতঃপর সে নিজের মধ্যে যে কাজের যোগ্যতা অনুভব করে, সেটি সম্পাদনের জন্যই আমাদের সামর্থানুযায়ী প্রচেষ্টা চালাবার দাবী জানাচ্ছি। এখন প্রয়োজন হলো, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্রবর্তী হয়ে মুহূর্তমাত্র দেরী না করে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করা।

শিক্ষিত সমাজ চিন্তাধারা ভাঙ্গা-গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। শিক্ষাবিদগণ দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে তৈরি করবেন। সাহিত্যিক সাহিত্যের বিভিন্ন পথ ধরে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালাবেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করবেন। প্রাবন্ধিক পত্র-পত্রিকায় মতবাদ প্রচারের কাজ শুরু করে দেবেন। আলোচনার মাধ্যমে যিনি অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তিনি ব্যক্তিগত প্রচার অভিযানে ব্যাপৃত হবেন। গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার অথবা সাধারণ মানুষকে বুঝাবার ক্ষমতা যিনি রাখেন, তিনি গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করবেন এবং জনগণের সংস্কার প্রচষ্টায় লিপ্ত হবেন।

সার কথা হলো এই যে, কোন শক্তির একটিমাত্র স্ফুলিংগ নষ্ট হতে পারবে না। তবে আপনি কতটুকুন কাজ করবেন এবং এর সীমা কি হবে- এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আপনার নিজের বিবেকই এর সর্বোত্তম ফয়সালা করতে পারে। আপনি এতটুকুন কাজ করবেন এবং এত পরিমাণ করবেন যে, এরপর আপনার বিবেক নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, আল্লাহ যখন আপনার নিকট থেকে আপনার শক্তি ও সময়ের হিসেব তলব করবেন, তখন যেন এই খেদমতের কার্যক্রম দেখিয়ে আপনি মাগফেরাত লাভের আশা করতে পারেন।

সবশেষে জনাব ফজলুর রহমানের (মুংগের) একটি পরিকল্পনার উপর আলোচনা চললো। পরিকল্পনাটির সার কথা হলো এই যে, জামায়াত সদস্যগণ হারাম অর্থ-সম্পদ থেকে দূরে থাকার কারণে জামায়াত যে আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়, তা দূর করার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিম্নোক্ত ধরনের ব্যবস্থায় পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ কতিপয় ধনী ও শ্রমজীবী মিলে অর্থ উপার্জন করবেন এবং এ অর্থ নির্ধারিত হারে পুঁজিপতি, শ্রমজীবী এবং জামায়াতের বাইতুলমালের মধ্যে

ভাগ করে দেয়া হবে। এভাবে বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ ও তালিম কেন্দ্র জারি করে কাজের গতি দ্রুততর করা যেতে পারে।

এ প্রস্তাবটি সম্পর্কে পরামর্শমূলক আলোচনা চলতে লাগলো বহুক্ষণ পর্যন্ত। মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এ প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। এতে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, যদি জামায়াত সদস্যগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তাহলে তো এটা খুব ভাল কথা এবং এর প্রয়োজন অত্যধিক। বরং যেখানে কোন সদস্য আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হন, সেখানেই তার সংকট দূর করার জন্য অন্যান্য সদস্যদেরকে যথাসাধ্য তৎপর হওয়া উচিত। কিন্তু জামায়াত হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য দাওয়াত ও প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায়ী-সুলভ কাজ করা উচিত নয়।

একটি বিপ্লবী জামায়াত যদি একদিক দিয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়, তাহলে প্রথমত তার প্রচেষ্টাবলী বিভক্ত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত কিছু লোক আসল প্রেরণা ছাড়াই নিছক আর্থিক স্বার্থের খাতিরে এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকবে। ফলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমীরে জামায়াতও এ অভিমতের প্রতি সমর্থন জানালেন। এতে কোনো রকমের ভোট গ্রহণ ছাড়াই ফজলুর রহমান সাহেব নিজেই এ দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে নিলেন এবং নিজের প্রস্তাবটি- যা তিনি বহুদিন থেকে চিন্তা-গবেষণা করার পর তৈরি করেছিলেন- বিনা দ্বিধায় প্রত্যাহার করলেন।

পরদিন জামায়াত সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত মতের আদান-প্রদান শুরু হলো। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জামায়াতকে স্থানীয় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমীরে জামায়াত পরামর্শ ও হিদায়াত (নির্দেশ) দিলেন।

সাধারণের সাক্ষাতকারের জন্য ২৩ অক্টোবর তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছিল। কিন্তু ২২ অক্টোবর বিকাল থেকেই দ্বারভাংগা ও অন্যান্য স্থান থেকে বিভিন্ন লোক আসতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে মুসলিম লীগ, ইমারতে শারইয়্যা, জমিয়তে উলামা এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গও ছিলেন।

তাদের সঙ্গে আমীরে জামায়াত এবং অন্যান্য রফিকগণ মত বিনিময় করতে থাকেন। তারা জামায়াতের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন এবং বিভিন্ন হালকায় জামায়াত সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তা অপনোদন করেন। এসব আলোচনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। তবু সংক্ষেপে দু-তিনটি কথার দিকে এখানে একটু ইংগিত করছি।

কোনো কোনো দলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ ভুল ধারণা প্রচার করা হয়েছে যে, আমরা সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের মনে করি। এর প্রভাব দ্বারভাংগায়ও পরিদৃষ্ট হয়েছিল। যদিও এর সক্রিয়া প্রতিবাদের জন্য একথাই যথেষ্ট ছিল যে, আমরা সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে জুমার নামায আদায় করেছি, তবু এরপরও লোকদের মনে এ প্রশ্নটি জেগে রইলো। কাজেই আমীরে জামায়াত পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে, এটি নিছক একটি মিথ্যা দোষারোপ। আমাদের সংস্কার আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্যই জেনে- বুঝেই এই মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সন্দেহটি হলোঃ সাধারণভাবে বিভিন্ন জামায়াতের মধ্যে একথা প্রচার করা হয়েছে যে, তাদের সঙ্গে আমাদের সরাসরি কোনো সংঘর্ষ বেধেছে। এ ব্যাপারে পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, সরাসরি কোনো জামায়াতের বিরুদ্ধে আমরা কোনো অভিযান (Campaign) চালাচ্ছি না। যেসব ব্যাপারে বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের বিরোধ রয়েছে, সেগুলো আমাদের লিটারেচারে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের আসল সংঘর্ষ হলো কুফরী জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে- সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব রাজনৈতিক দল (Political Bodies) কাজ করছে তাদের সঙ্গে নয়।

অনেক লোক একথাও বুঝতে চাচ্ছিলেন যে, এই ইসলামী বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হবে? এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মওলানা মওদূদী বলেন যে, আরম্ভ হামেশা চিন্তাধারার পরিবর্তন এবং মানসিকতাকে নতুন করে গঠন করা থেকে হয়। এরপর একটি আদর্শিক দলকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে জাতীয় দলের ন্যায় কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। একটি জাতির জন্যে অবশ্যই এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, অন্যান্য জাতির মোকাবিলার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক এবং সাজ-সরঞ্জাম সে কোথা থেকে আনবে? কিন্তু একটি আদর্শিক দলের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নাবলী একেবারেই গুরুত্বহীন। তার জন্য শুধু একটিমাত্র বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তার দাওয়াত নিয়ে যেসব লোক অগ্রসর হবে, তারা নিজেদের নীতি ও আদর্শের উপর আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে সত্যিকারভাবে ঈমান আনবে। একমাত্র এর মাধ্যমেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মন-মগজের উপর বিজয়লাভ করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে দাওয়াত যখন এমন মনযিলে উপনীত হয়, যেখানে সমকালীন ব্যবস্থার সঙ্গে তার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়, তখন সমকালীন ব্যবস্থা থেকেই আপনা

আপনি সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক সে লাভ করতে থাকে। তাকে মানুষ তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। তৈরি করা মানুষকে জয় করতে হয় শুধু।

"ইসলামী অধ্যয়ন বিভাগ"- এর পক্ষ থেকে সাধারণ সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কর্মসূচিতে জনগণের উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের বক্তৃতাও ছিল। এব কার্যসূচি অনুযায়ী অনেক লোক স্রেফ মওলানার বক্তৃতা শোনার জন্য জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সভার কর্মকর্তাদেরকে তাদের কার্যসূচি বদলাতে হলো এবং মওলানা বক্তৃতা করতে পারলেন না। এর কারণ হলো এই যে, দ্বারভাংগায় একটি দল কয়েক দিন আগে থেকেই হাংগামা সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল এবং লোকেরা সভাস্থলেই দলাদলি এবং হাংগামা শুরু করে দেবে এর সম্ভাবনা দেখা দিল।

এ পরিস্থিতি দেখে আমীরে জামায়াত সভায় হাজির হতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা, তার স্থায়ী নীতি হলো ফিত্না ও হাংগামা থেকে দূরে সরে থাকা এবং যেখানে লোকেরা আমাদের দাওয়াত শুনতে চায় না, সেখানে জবরদস্তি তাদের কানে হকের আওয়াজ প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা না করা। কাজেই তার পরিবর্তে লাহোরের 'মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মোঃ নসরুল্লাহ খান আযীয সাহেব জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতা মোটামুটি কামিয়াব হয়।

দারুল ইসলাম সম্মেলনের কার্যবিবরণী

আগের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চ দারুল ইসলামে (ভারতের পাঠানকোটের সন্নিকটে) উত্তর ভারতের (পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তান) জামায়াতে ইসলামী সদস্যদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে কতিপয় সমর্থকও শরিক হন। উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে জনাব মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও জনাব মুহাম্মদ হাসনাইন সাইয়েদও (লাহারিয়া সরাই দ্বারভাংগা) তাশরীফ আনেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ।

অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার

২৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং পুনরায় যোহরের নামায থেকে আসর পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি দলসমূহ আমীরে জামায়াতের সঙ্গে প্রকাশ্যে সাক্ষাত করে নিজেদের স্থানীয় পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তারা নিজেদের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন, বাধা ও প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহে পরামর্শ নেন। ইত্যবসরে কয়েকজন নিজেদেরকে জামায়াতের রুকন (সদস্য) হবার জন্য পেশ করেন। এ পরিস্থিতিতে আমীরে জামায়াত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে এখানে সংযুক্ত করা হলো ঃ

সদস্যপদ প্রার্থীদের প্রতি

আমাদের এখানে জামায়াতে শামিল হবার পথে কোনো বাধা নেই। তবে জামায়াতে শরিক হবার পর দায়িত্বের যে বিরাট বোঝা বহন করতে হয়, সম্মুখে অগ্রসর হবার আগেই তার ওজন অনুভব করে নেয়া উচিত। সদস্যপদের দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক আন্দাজ না করেই যারা আমাদের দিকে অগ্রসর হন, তারা আদর্শ ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অধিক সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে

সহযোগিতা করতে পারেন না। কারণ শুরুতে কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতার উপর গভীর দৃষ্টি থাকে না কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে এ বিভিন্নতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তখন লোকেরা নিজেদের পছন্দমত কর্মপদ্ধতি প্রীতির প্রাবল্যে জামায়াতের শৃংখলা বিরোধী কাজ করে বসেন এবং অনেক সময় লক্ষ্য থেকেও গাফেল হয়ে যান। যদি আপনারা খুব ভালো করেই আমাদের কর্মপদ্ধতিগুলোর সঙ্গে এর পার্থক্য অনুধাবন করে থাকেন উপরন্তু স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আপনারা অন্যান্য কর্মপদ্ধতিগুলো ছেড়ে আমাদেরটা গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়ে থাকেন, তাহলে আসুন, বিসমিল্লাহ! অন্যথায় তাড়াহুড়া করবেন না। গভীর মনোযোগের সাথে আমাদের সাহিত্য পড়তে থাকুন এবং আরো বেশ কিছুদিন প্রত্যক্ষ করার পর চূড়ান্ত রায় কায়েম করুন।

আলহামদু লিল্লাহ! মুসলমানদের মধ্যে এখনো নির্ভুল আকীদাসম্পন্ন লোক যথেষ্ট রয়েছে। হকের অস্তিত্ব তাদের নিকট আছে কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বিভিন্ন দল কোনো না কোনো আংশিক হককে নিয়ে চলছে। এর বিপরীত পক্ষে আমরা সমগ্র ও পূর্ণ হক নিয়ে চলতে চাই। আমাদের সঙ্গে আগে থেকে যে আংশিক হক রয়েছে তা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকবে। কিন্তু শুধু এরি উপর সন্তুষ্ট হবেন না, হকের অন্যান্য অংশগুলোকেও এখন আপনাদের এর সঙ্গে একত্র করতে হবে।

অতঃপর এক সময় প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হলো। এ প্রসঙ্গে আমীরে জামায়াত সংক্ষেপে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

প্রচার পদ্ধতি

আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে সাধারণত মুসলিম জামায়াতগুলো কঠোরতার পথ অবলম্বন করে। ভাবাবেগের প্রাবল্যে, তার্কিকসম কূট কৌশল ও ভাষার চপলতায় মানুষকে নিজেদের দিকে টেনে নেয়। কিন্তু আমাদের আদর্শ প্রচারের জন্য এ পদ্ধতি সংগত নয়। এ ব্যাপারে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিতর্ক ও আলোচনার যে প্রচলন আমাদের দেশে আছে এতে প্রচারক অবচেতনভাবে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং এতটুকুও অনুভব করতে পারেন না যে, তিনি নিজেই নিজের প্রিয় আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করছেন। এর বিপরীত পক্ষে আমাদের একজন ডাক্তারের ন্যায় কাজ করতে হবে- যিনি শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেন রুগ্ন অংশটিকে সুস্থ করে তুলতে এবং যদি কখনো তাকে কেটে দেহ থেকে পৃথক করতে হয়, তাহলে তা একমাত্র তখনই করেন যখন অন্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করার পর তার আরোগ্য লাভ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু

এখনকার অবস্থা হলো এই যে, আমাদের ডাক্তার সর্বাগ্রে রুগ্ন অংগটিকে কেটে ফেলতে প্রস্তুত হয়ে যান।

মনে রাখবেন, জনগণের এই যে বিরাট ভীড় আপনাদের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করেছে এদের মধ্য থেকে যেসব লোক কুফরী, শির্ক ও ফাসেকীর ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাদের চিকিৎসা ক্রোধ ও তিক্ততার দ্বারা করার পরিবর্তে সবর ও সহানুভূতির দ্বারা করতে হবে। এসব রুগ্ন অংগকে সঙ্গে সঙ্গেই কেটে ফেললে চলবে না বরং এদের ওপর অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করে দেখে নিতে হবে।

জনগণের অক্ষমতার ব্যাপারটা শুধু এ থেকেই আন্দাজ করতে পারেন যে, তাদের মধ্যে নানান ধরনের শির্ক মিশ্রিত আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ ধর্মের পবিত্র দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছে। এ জন্যই তাদের সংস্কারের প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে এবং সবর ও সহিষ্ণুতার দ্বারাই এ ব্যাপারটির সমাধান করা যেতে পারে। আরবেও এ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং সেখানেও ঠাণ্ডা পদ্ধতিতে প্রচারের কাজ করা হয়েছে।

প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক

কার্যসূচি মোতাবেক প্রথম বৈঠক ঐদিন মাগরিবের নামাযের পর থেকে নিয়ে ইশা'র নামাযের কিছু পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আমীরে জামায়াত তাঁর জামায়াতের কার্যাবলী এবং সে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর উপর বিস্তারিত মন্তব্য করেন। এ মন্তব্য অতিরিক্ত ছিল না আবার কমও ছিল না। বিরোধীদেরকে আতংকিত করা অথবা রফিকদের ভাবাবেগকে উত্তেজিত করা এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ বক্তৃতার মাধ্যমে জামায়াতকে তার দুর্বল দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে তার সংশোধনের পথ সুগম হয়। নীচে মওলানার সে বক্তৃতার বিবরণ সংযোজিত করা হলো।

আমীরে জামায়াতের বক্তৃতা

আমাদের সভা- সম্মেলনের ধরন ও উদ্দেশ্য

খোত্‌বায়ে মাসনূনার পর আমীরে জামায়াত বলেন ঃ

বন্ধুগণ! আপনারা নিজেরাই আন্দাজ করতে পেরেছেন, আমাদের সভা-সম্মেলনের ধরন পারিভাষিক সভাগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধারণত সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা হয়ে থাকে, শোভাযাত্রা বের হয়, শ্লোগান দেয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের কিছুই এখানে হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না। হাংগামা করা বা জনগণের দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ করানো আমাদের এ সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো শুধু এই যে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হবো, পরস্পরের নৈকট্য লাভ করবো, আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বের করবো।

নেতার সঙ্গে আপনি এবং আপনার সঙ্গে নেতা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবেন এবং তিনি আপনার শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করতে পারবেন। যার ফলে তিনি আপনাকে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে কাজ করাবার চেষ্টা করবেন। মাঝে মাঝে আমরা নিজেদের আর নিজেদের কাজ পর্যালোচনা করতে থাকবো, নিজেদের ভুল-ত্রুটিগুলো অনুধাবন করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করবো এবং পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজকে অগ্রসর করার পন্থা চিন্তা করবো। সারকথা হলো এই যে, আমাদের এই সভা-সম্মেলনগুলোর মধ্যে কার্যকরী শক্তি ও কর্মস্পৃহা আছে। এর মধ্যে সাধারণ সভা-সম্মেলন ধরনের কোনো জিনিস আপনারা পেতে পারেন না এবং পাবার আকাংখা পোষণ করাও আপনাদের উচিত নয়। যদি এখনো পর্যন্ত সভা অনুষ্ঠানের পুরনো অভ্যাসের কিছুটা প্রভাব আপনাদের মধ্যে থেকে থাকে এবং তার কোনো প্রকার অতৃপ্তি আপনারা নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন, তাহলে এখনই তাকে বের করে দেবার চেষ্টা করুন।

এইসব হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আসলে কিছুই নেই। বাজে কাজে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না। কাজের কথা বলুন এবং তারপর নিজের কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হোন। আজ সকাল থেকে আমি বিভিন্ন স্থান হতে আগত দল ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি। আমি অনুভব করেছি, কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা

বলার ইচ্ছা লোকের মনে জেগে ওঠে এবং অনেক সময় আসল ব্যাপার বর্ণনা অনুযায়ী হয় না। এটি একটি দুর্বলতা। একে দূর করার চেষ্টা করা উচিত। এতে সন্দেহ নেই যে, যেসব অভ্যাস দীর্ঘকাল থেকে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তা বহু কষ্টে দূর হবে, কিন্তু তা পরিত্যাগ করার জন্য আপনাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

সভায় উপস্থিতির গুরুত্ব

এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আমি যা কিছু দেখেছি, বাইরের খবরাখবর থেকে যা কিছু আন্দাজ করতে পেরেছি এবং আজ আপনাদের সঙ্গে পৃথকভাবে ও এক সঙ্গে মত বিনিময় করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার ভিত্তিতে আমি মনে করি যে, আমাদের চরম সতর্কতা সত্ত্বেও এমন বেশ কিছুসংখ্যক লোক আমাদের দলে প্রবেশ করেছেন, যারা আসলে এ কাজ সম্পর্কে কোনো গভীর আগ্রহ রাখেন না। এই আগ্রহহীনতার সুস্পষ্ট আলামত হলো এই যে, এখানে সম্মেলনে যোগদানের জন্য সাধারণভাবে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল এবং ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এতে রুকনদের (সদস্য) খুব বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে হবে, কিন্তু অনেক রুকন কোনো যুক্তিসংগত অক্ষমতা ছাড়াই অনুপস্থিত রয়েছেন বরং অনেকে তো অক্ষমতা পেশ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তাদের নিকট জামায়াতের আহ্বানে সাড়া দেবার চাইতে তাদের মামুলি কাজ, তাদের দৈনন্দিন কাজ-কারবার, তাদের ঘর-সংসারের ব্যাপার এবং দুনিয়ার স্বার্থ বেশী গুরুত্ব রাখে এবং এজন্যই সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তারা বসে রয়েছেন।

আমাদের অনেক রফিক যে এ কাজে সত্যিকার আগ্রহ ও মনোযোগ দেন না এটি তারই প্রমাণ। যদি সত্যিকারভাবে তারা জানতেন যে, এসব সভা-সম্মেলনের অর্থ কি, জামায়াতের আহ্বান শুনার পর তাদের কর্তব্য কি এবং নিজেদের প্রতিপালকের সঙ্গে যে শপথনামায় তারা আবদ্ধ হয়েছেন তার ফলে তাদের উপর কি দায়িত্ব এসে পড়েছে, তাহলে তারা নিজেদের বৃহত্তম পার্থিব স্বার্থ এবং বিপুল কর্মব্যস্ততাকে কখনো এখানে হাজির হবার চাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে পারতেন না। আজ যখন তাদের এই অবস্থা, তাহলে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, আগামীতে যখন কোনো বিরাট কাজ সামনে থাকবে এবং আমরা তাদেরকে আহ্বান করতে থাকবো, তখন তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবেন! জামায়াতী ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর মানুষের জন্য জামায়াতের আহ্বান শুনে দৌড়ে চলে আসার এবং যাবতীয় কাজ-কারবার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আল্লাহ ও রাসূল যে সব অবস্থায় 'রুখসাত' দিয়েছেন শুধু সেই সব অবস্থাই এর ব্যতিক্রম

হতে পারে। এ সব অবস্থা ছাড়া বাকি সকল অবস্থায় জামায়াতে শরীক হবার জন্য অন্যান্য সব রকমের কাজ-কারবার থেকে পৃথক হওয়া একান্ত জরুরী।

যতদিন পর্যন্ত জামায়াতের রুকনদের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি না হবে, ততদিন জামায়াতের সংগঠন একেবারেই নিষ্প্রাণ থাকবে। কোন ব্যক্তির এই ধারণা নিয়ে বসে যাওয়া যে, এখন কোনো বিশেষ কাজ নেই, সভার কোনো সত্যিকার প্রয়োজন নেই এবং এখন শরীক না হলে কোনো ক্ষতি হবে না- আসলে একটি ভুল ধারণা! আমি বলি, যদি এখানে মোটেই কোনো কাজ না থাকে বরং আপনাদেরকে শুধু একত্র হবার জন্যই আহ্বান জানানো হয়, তাহলেও আপনাদের একটি মাত্র আহ্বানেই একত্র হওয়া উচিত ছিল। কেননা, এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে আপনাদের মধ্যে একটিমাত্র আহ্বানে একত্র হয়ে যাবার যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই শৃংখলা ছাড়া কোন্ কাজটা আপনারা সংগঠন ও সহযোগিতার সঙ্গে করতে পারবেন?

যেসব সদস্য নিষ্ক্রিয় আছেন

এই সম্মেলনের সময় যে নীরবতা প্রকাশ করা হলো এ যে শুধু ঘটনাচক্রে হঠাৎ এসময় প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, আমি জানতে পেরেছি, বিভিন্ন স্থানে আমাদের জামায়াতের অনেক অথবা অধিকাংশ রুকন (সদস্য) সাপ্তাহিক বৈঠকে শরীক হন না অথবা শরীক হলেও নিয়মিত নয় বরং সুবিধা মতো যখন দুনিয়ার ছোট-বড় কোনো কাজ তাদের থাকে না এবং কিছুটা ঘুরে বেড়াবার খায়েশ জাগে, তখন স্থানীয় জামায়াতের বৈঠকে হাজির হন। অনেক জায়গায় নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। অনেক রুকন এমনও আছেন, যারা জামায়াতে শামিল হবার এবং জেনে-বুঝে আল্লাহর দাসত্বের একরারনামা তাজা করার পরও পূর্ববৎ নিষ্ক্রিয়, স্থবির ও নিষ্প্রাণ রয়েছেন।

তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি, জাহিলী পরিবেশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধেনি, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবার জন্য কোনো উদ্যম তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি এবং সহযোগীদের সঙ্গে কোনো প্রকার মানসিক সংযোগ-সম্প্রীতি রক্ষার প্রবণতাও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ শুরুতে জামায়াত কায়েম করার সময় আমরা বলে দিয়েছিলাম এবং পরেও বার বার বলে এসেছি যে, সংখ্যাধিক্য দেখাবার জন্য আমরা অযথা রুকনদের ভর্তি করতে চাই না। এমন মাংসল দেহ আমরা চাই না, যা শরীরকে শক্তিশালী না করে উল্টো তাকে ভারী করে দেয়। আমাদের শুধু সেইসব লোকের প্রয়োজন, যারা আসলে কিছু করতে চায়। বাইরের

চাপে নয় বরং ঈমানের আভ্যন্তরীণ তাগিদে যারা আল্লাহর দীন কায়েম করার প্রচেষ্টা চালাতে ইচ্ছুক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনবরত এসব কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পরও আমাদের মধ্যে এমন সব লোক প্রবেশ করেছে যারা ইতিপূর্বে শুধুমাত্র মুসলমানদের দলের সঙ্গে সম্পর্কের যুক্তিকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের নিকট আমার আবেদন, এসব করাই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই গরীব জামায়াতটিকে নষ্ট করার কী এত প্রয়োজন ছিল? আপনাদের মনে যদি সত্যি সেই আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য কোনো সহানুভূতি থেকে থাকে যার খেদমতের জন্য আমাদের এ জামায়াত গঠিত হয়েছে এবং এ সহানুভূতিই যদি আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী করে থাকে, তাহলে আপনাদের সহানুভূতির সর্বনিম্ন চাহিদা হওয়া উচিত এ জামায়াতটিকে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা এবং যে সব রোগের জন্য মুসলমানরা সুদীর্ঘকাল থেকে কোনো সঠিক কাজ করতে পারেনি সেগুলো থেকে একে দূরে রাখা।

জামায়াত থেকে যারা পৃথক হয়ে গেছেন

এর চাইতেও দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই যে, গত দু'বছরে অনেক সহযোগী আমাদের জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং দু'একজন ছাড়া বাকি সবার মধ্যে প্রায় এই বিচ্ছিন্নতা পশ্চাদগামিতার রূপ নিয়েছে। আপনারা জানেন এবং আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, জামায়াতে শামিল করার আগে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝবার ও চিন্তা করবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছি। দীনকে, তার দাবী ও চাহিদাগুলোকে, নিজেদের উদ্দেশ্যকে এবং তা হাসিলের পদ্ধতিকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করেছি। অতঃপর জামায়াতে প্রবেশ করার সময়ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্টভাবে সেই সব দায়িত্ব পেশ করেছি যা তাওহীদ ও রিসালাতের সচেতন স্বীকৃতির পর তার ওপর অর্পিত হয় এবং এমনি করে সবকিছু পরিষ্কারভাবে পেশ করার পর প্রত্যেক সদস্য পদপ্রার্থীকে জিজ্ঞেস করেছি যে, এই শপথের ওজন পুরোপুরি অনুভব করে সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় কি তিনি এ বোঝা বহন করতে প্রস্তুত আছেন?

এভাবে সব রকমের সন্দেহ, সংশয় ও ভুল বুঝাবুঝির উর্ধে থেকে যারা শপথ করেছেন কেবল তাদেরকেই জামায়াতে শামিল করা হয়েছে। এ ধরনের সুচিন্তিত, সুবিবেচনা প্রসূত ও মাপাজোকা শপথের পর জামায়াতের সংগঠন থেকে কোনো

ব্যক্তির আলাদা হয়ে যাবার যদি কোনো যুক্তিসংগত পদ্ধতি হতে পারতো, তাহলে তা এই হতো যে, তিনি আমাদের মধ্যে মোনাফিকির গন্ধ পেয়ে অথবা আমাদের জামায়াতী ব্যবস্থায় কোনো প্রকার ভয়াবহ দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতেন এবং এরপর আমাদের চাইতে বেহতের পদ্ধতিতে অধিক দ্রুততার সঙ্গে নিজের লক্ষ্যের পথে ধাবিত হতেন, যাকে তিনি স্থিরচিত্তে অনেক ভেবে-চিন্তে জেনে-বুঝে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এ পরিস্থিতিতে তাকে আমাদের চাইতে অগ্রবর্তী দেখে আমরা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তার সঙ্গে একত্র হতাম।

কিন্তু এখানে যে অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হলো এই যে, যে সমস্ত লোক পূর্ণ সচেতনভাবে তাড়াতাড়ি নয় বরং "ভাল করে ভেবেচিন্তে- আমাদের নিকট নয় বরং নিজেদের আল্লাহর নিকট শপথ করেছিলেন, তারা জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং আলাদা হবার পর তাদের মধ্য থেকে অনেকে নিশ্চুপ ও স্থবির হয়ে গেছেন। অনেকে সেইসব দলের দিকে ফিরে গেছেন যাদের সম্পর্কে তারা বলতেন যে, তাদের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ দেখে এবং তাদের থেকে হতাশ হয়ে তারা 'সজ্ঞানে' এদিকে এসেছেন এবং অনেক জালেম তো আবার এমনভাবে পিছু দৌড় দিয়েছেন যে, তারা যে দীনদারী ও শরীয়তের অনুগত হয়েছিলেন এবং নৈতিক পরিশুদ্ধির যে প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন তারও বেশীর ভাগকে নাকচ করে দিয়ে পূর্ববৎ আবার সবকিছুই করে যাচ্ছেন।

তাদের কয়েকজনকে পিছনের মোহ এতবেশী পেয়ে বসেছে যে, তারা নামায ত্যাগ করেছেন, যেসব হারাম জিনিস থেকে তারা দূরে থাকতে শুরু করেছিলেন তার মধ্যে আগের চাইতেও বেশী ডুবে যাচ্ছেন এবং পরিচিত নৈতিক দায়িত্বগুলো থেকেও বেপরোয়া হয়ে পড়েছেন। তাদের এ অবস্থা আমাকে যে কতটা পীড়িত করেছে, তা আমি আপনাদেরকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

নীরবতার কারণ

আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এ নীরবতা, শপথ ভঙ্গ ও পশ্চাদমুখিতার আসল কারণ কি?

প্রথম কারণ

আমার মতে প্রথম ও মৌলিক দোষ হলো এই যে, আমরা যে জাতির মধ্যে কাজ করতে অগ্রসর হয়েছি অনবরত কয়েক শতাব্দীর অধঃপতন তার নৈতিক বুনিয়াদকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে। তার মধ্যে সেই চারিত্রিক শক্তি খুব কমই

রয়ে গেছে যার শক্তিশালী পাষাণ ফলকে অটল ফায়সালা, স্থায়ী এরাদা, সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং নির্ভরযোগ্য শপথ ও চুক্তি কায়েম থাকে।

সুদীর্ঘকাল থেকে তার মধ্যে এ দুর্বলতা লালিত হচ্ছে যে, একটি জিনিসকে হক বলে জানবার এবং দিল থেকে তা হক বলে মেনে নেবার পরও তার জন্য কোনো প্রকার কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয় না- সে নিজের শক্তির, অর্থের, আশা-আকাংখার, নিজের প্রিয় চিন্তা ও আদর্শের, নিজের জাহেলী রুচি ও আগ্রহের এবং অন্য যে কোন জিনিসেরই কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয় না। যে হককে শুধু মুখে 'হক' বলা, তার ওপর শাব্দিক শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষণ করা এবং তার জন্য কতিপয় লোক দেখানো কাজ করা যথেষ্ট হয় এবং তারপর সে হকের বিরুদ্ধে নিজের সব রকমের কাজ-কারবার, নিজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জীবনের সমগ্র ব্যাপার পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা যায়, সেই হক-পরস্তির আবেদন তার হৃদয়কে বেশী করে স্পর্শ করে। এজন্যই সে তথাকথিত ধার্মিকতার পথে সানন্দে অগ্রসর হয়।

এ পথে দীনদারী এবং প্রচেষ্টা ও ক্রিয়ার যাবতীয় ভিত্তি ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে আপোসের (Compromise) ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এমন হক-পরস্তি তাদের জন্য একটি অসহনীয় কঠিন বোঝাস্বরূপ যা কুফর ও ইসলাম, হক ও বাতিল এবং আনুগত্য ও বিদ্রোহের মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা চায় এবং যার মধ্যে হককে মেনে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিটি ব্যক্তির নিকট প্রথম দাবী এই যে, তাকে একাগ্র হতে হবে। অতঃপর আরো দাবী হয় যে, যে জিনিসটাকে সে হক বলে মেনে নিয়েছে তার জন্য তার নিজের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে কুরবানী করতে হবে, সারা জীবনের জন্য কুরবানী করতে হবে। ধন-সম্পদ, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-আগ্রহ, আশা-আকাংখা, গভীরতম সম্পর্ক, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতা- এক কথায় সব রকমের কুরবানী বরদাশত করতে হবে।

দু-এক দিনের জন্য নয়, চার-ছয় মাসের জন্য নয়, কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয় বরং যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন বরদাশত করতে হবে। মুসলমানদের এই অবনতির যুগেও আপনারা এমন অনেক মুসলমান দেখতে পাবেন, যারা সানন্দে জান কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। গুলীর সামনে বুক পেতে দেবে। মাথায় লাঠির আঘাত সহ্য করে নেবে। জেলের কষ্ট বরদাশত করে নেবে।

এসব হলো তাদের জন্য অতি ক্ষুদ্র ও হালকা কাজ। এগুলোকে তারা অতি সহজে বরদাশত করতে পারে। কিন্তু নিজেদের সমগ্র জীবনকে একটি বিধানের নিয়ন্ত্রণাধীন করা, সারা জীবন একটি উদ্দেশ্যের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া, ইচ্ছা-বাসনার গলায় লাগাম দিয়ে রাখা, অভ্যাস ও মানসিকতা পরিবর্তন করা এবং বাইরের কোনো চাপ ছাড়াই নৈতিক দায়িত্বগুলো গ্রহণ ও পালন করা

আসলে তাদের জন্য অনেক ভারী বোঝা। এগুলো মাথায় নিয়ে চলা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তারা সারাজীবন অতিবাহিত করতে পারে কিন্তু ত্যাগ-সাপেক্ষ কোনো শপথ গ্রহণ করে দু-এক বছর চলাও তাদের পক্ষে বড় কঠিন। তাদের সংকল্প দুর্বল হয়ে গেছে। তাদের ফায়সালা-শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাদের অভ্যাস, শক্তিশালী ইচ্ছা-বাসনা, বিশ্বাস ও কর্মের সমতা এবং কোনো ব্যবস্থার অনুগত হয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তারা জঙ্গলের সেই ঘোড়ার মতো, যে তার জন্মের দিন থেকেই লাগামহীন অবস্থায় ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। কোনো গাড়ীর জোয়াল ঘাড়ে করে একটা নির্ধারিত পথে সোজাভাবে চলতে কখনো প্রস্তুত হয় না। এমনি একটি ঘোড়াকে কোনোক্রমে বশ করে যদি বেঁধেও রাখা যায়, তাহলেও অতি শিগগিরই সে বাঁধনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, এমনকি একদিন দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় এবং আগের চাইতে অনেক দূরে চলে যায়।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় যে মৌলিক দুর্বলতাটি আমি প্রতিদিন গভীরভাবে অনুভব করছি সেটি হলো এই যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ তো দীন সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তার প্রাণবস্তু হৃদয়ংগম করা থেকে বঞ্চিত আছেই কিন্তু আমাদের মধ্যে যেসব লোক ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী তারাও এ ব্যাপারে আরো বেশী পশ্চাৎপদ। আন্তরিকতাসম্পন্ন এবং নেক লোকদেরও অবস্থা এই যে, তারা দীনদারী, দীনদারীর শিল্পকারিতা এবং পেশাগত দীনদারীর পার্থক্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন।

দীনের আসল মূল্যবোধগুলোকে অন্যান্য মূল্যবোধের দ্বারা পরিবর্তিত করে নিয়েছেন অথবা তাদের একটির মধ্যে অন্যটি মিশিয়ে দিয়েছেন। যেসব জিনিস দীনের মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বরং বুনিয়াদী গুরুত্বের অধিকারী, সেগুলো আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিতে নিছক সামান্যতম গুরুত্ব লাভ করতে পেরেছে। কেননা সুদীর্ঘকালের শিক্ষা-দীক্ষা তাদের চিন্তা-পদ্ধতিকে এভাবে গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে যেসব জিনিস দীনের মধ্যে কোনো গুরুত্ব রাখে না অথবা রাখলেও নিছক আনুসংগিক গুরুত্বের অধিকারী, সেগুলোই তাদের নিকট দীনের ভিত্তি স্বরূপ।

কেননা দীনদারীর শিল্পকারিতা ও পেশাগত দীনদারী এগুলোকে এ মর্যাদাই দিয়েছে। আলেম, সাধারণ মানুষ অথবা মধ্যম শ্রেণীর লোক যেই হোক না কেন,

তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে যিনি দীন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে একথা জানেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে কোন্ জিনিসটা কোন্ পর্যায়ের করণীয়, কোন্ জিনিসটার ওপর কতটুক জোর দেয়া উচিত এবং কোন্ জিনিসটা কার জন্য ত্যাগ করা যেতে পারে।

মূল্যবোধের তুলনামূলক পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমাদের ও সাধারণ ধার্মিক লোকদের মধ্যে এই যে বিরোধ, এ ব্যাপারে আমি অনুভব করি, এটাও বহু নীরবতা ও রক্ষণশীলতার একটি বিরাট কারণ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা অক্ষম। দীনকে ভালোভাবে জেনে-বুঝে ইকামাতে দীনের (দীন প্রতিষ্ঠার) যে লক্ষ্য আমরা নিজেদের সম্মুখে স্থাপন করেছি, তার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না এবং যদি মানুষের মধ্যে তৎপরতা সৃষ্টি করা অথবা পশ্চাদপসরণকারীদেরকে রক্ষণশীল কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা দীনের মূল্যবোধগুলোর আসল পর্যায়ক্রমিক পার্থক্য পরিবর্তন করার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে এমন তৎপরতা এবং কোনো পশ্চাদপসরণকারীর পলায়নের শব্দ- তা যেখানেই হোক না কেন- আমাদের কাম্য নয়।

তৃতীয় কারণ

এই নীরবতা ও রক্ষণশীলতার আর একটি নীতিগত কারণ হলো এই যে, অনেক লোক এ জামায়াতের সদস্যের দায়িত্ব এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও দলগুলোর সদস্যদের দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। তারা এখনো পুরোপুরি অনুভব করেননি যে, এ জামায়াতে শরীক হবার অর্থ কি। তারা এখনো ধারণা করেন যে, এটাও বুঝি এমনি কোনো একটি প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে কোনো সামান্য আকর্ষণের কারণে শামিল হয়ে যাওয়া এবং শামিল হবার পর এর কাজে আগ্রহশীল না হওয়া অতঃপর ছোট-বড় কোনো একটি অপসন্দের অজুহাতে এ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া মানুষের দীন ও ঈমানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। অথচ আসলে এ জামায়াতটির ব্যাপার সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও দলগুলো থেকে ভিন্ন রকমের।

এ জামায়াতটি একমাত্র সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠিত হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের আসল লক্ষ্যই এর লক্ষ্য। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে দুনিয়ায় যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল এর সম্মুখেও সেই কাজ রয়েছে। এর মধ্যে প্রবেশ করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে সেই শপথ গ্রহণ করতে হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে 'লেনদেন' নামকরণ করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"আসলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন।" (আত্ তাওবা ঃ ১১১)

এহেন জামায়াতে শামিল হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নেই ভালোভাবে যাচাই করে নেয়া উচিত যে, সত্যিই এর উদ্দেশ্য, ধরন এবং কর্মসূচি এই কিনা। অনুসন্ধানের পর এসব ব্যাপারে যদি তিনি সন্তুষ্ট না হতে পারেন, তাহলে জামায়াতে শামিল হওয়াটাই তার ভুল। কিন্তু যদি তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন এবং এই বিশ্বাস নিয়ে জামায়াতে শামিল হন যে, গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এ জামায়াতের সত্যিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং যদি এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি বেশ ভেবে-চিন্তে আল্লাহর সঙ্গে লেনদেনের চুক্তি করে থাকেন, তাহলে এরপর আপনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, এই ধরনের যোগদান ও লেনদেনের চুক্তির মর্যাদা কখনো এমন একটি জামার মতো হতে পারে না যেটিকে ইচ্ছা মতো পরিধান করা এবং ইচ্ছা মতো খুলে রাখা যায়।

এদিকে কদম বাড়াবার আগে নিজের ফিরে যাবার কিশতিগুলো জ্বালিয়ে দিন। একথা বুঝে নিয়েই অগ্রসর হোন যে, এখন আপনার জন্য ফিরে যাবার কোনো স্থান নেই। আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি করার পর যে জান-মালকে আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন, তা আর ফেরত নিতে পারেন না। এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি প্রাণপণ করে বসেছেন। এখন প্রাণ দান করেই আপনাকে এ কাজ করতে হবে, নিজেকে এ পথে চলতে হবে এবং অন্যদেরকেও চালাতে হবে। কোনো ত্রুটি প্রকাশ হতে দেখলে পালাবার চিন্তা করবেন না কমপক্ষে সেই প্রেরণা ও আবেগের সঙ্গে তা দূর করার চিন্তা করুন। সামনের ব্যক্তি যদি না চলে, তাহলে পেছন থেকে সরে যাবেন না বরং হয় তাকে চলতে বাধ্য করুন, নয়তো তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজে সামনের দিকে অগ্রসর হোন।

এখানে এসে যদি আপনি এ কাজে আগ্রহ প্রকাশ না করেন অথবা সময়, ধন, শ্রম, মন, মগজ, দেহ ও প্রাণের শক্তি এ পথে ব্যয় করতে প্রস্তুত না হন অথবা অন্য কাজকে এ কাজের চাইতে অগ্রবর্তী করেন, তাহলে আপনি নিজে আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। আপনি কোনো মানুষের সঙ্গে শপথ করেননি, করেছেন আল্লাহর সঙ্গে। জামায়াতে শামিল হবার সময় আপনি যে শপথ করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি নিজেই সবকিছু এবং নিজের সত্তাকে আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন আপনার প্রত্যেকটি জিনিসের উপর সর্বাগ্রে এবং সর্বপ্রথম

হক হলো আল্লাহর ও তাঁর কাজের। বাকি আর সব জিনিসের হক এর পরবর্তী পর্যায়ের।

এসব কথা আমি আপনাদেরকে এজন্য বলছি যে, এখন থেকে আমাদের সামনে যে কাজ আছে তার বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আপনারা ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন। আমাকে প্রায়ই তাগিদ দেয়া হয় যে, আপনি শিগগির কোনো বৃহত্তর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কিন্তু এইমাত্র যেসব দুর্বলতার কথা আমি উল্লেখ করলাম, সেগুলো দেখা ও জানা সত্ত্বেও যদি আমি কোনো বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বসি, তাহলে আমার চাইতে বড় নাদান আর কেউ হবে না। এই সব চারিত্রিক ও নৈতিক ত্রুটি এবং দৃষ্টি ও জ্ঞানের এই ভ্রান্তিগুলোসহ দুনিয়ায় সবচাইতে বড় কাজ তো দূরের কথা কোনো একটি বড় কাজও করা যেতে পারে না।

দুনিয়ার জীবনব্যবস্থায় যে সর্বব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করা আমাদের কাজ, তার জন্য একটি অন্য ধরনের মানসিকতা ও চরিত্রের প্রয়োজন, যাকে ঢালাই ও তৈরি করার কোনো ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল থেকে আমাদের দেশে হয়নি। বহুকাল থেকে যে ছাঁচ আমাদের এখানে তৈরি হয়ে আছে তা নৈতিক বৃত্তি, অভ্যাস, মানসিকতা ও চরিত্রকে এ কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঢালাই করে আসছিল। আমাদের পরিকল্পিত কাজের জন্য কোনো বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে আমাদের এই জীর্ণ ছাঁচগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অনবরত চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে নতুন চরিত্র, নতুন মানসিকতা, নতুন অভ্যাস এবং নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। এগুলো আসলে নতুন নয় বরং এ সবগুলোই পুরানো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ এগুলো আমাদের জন্য নতুনে পরিণত হয়েছে।

জেনে রাখুন, কোনো ফাসেক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দলকে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের যমীনের পরিচালনা এবং নিজের সৃষ্টির নেতৃত্বের পদে সমাসীন হতে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়া একটি সৎ ও সংস্কারকারী দলের (বিক্ষিপ্ত জনতা নয় বরং শৃংখলাবদ্ধ দল) অস্তিত্ব থেকে একেবারেই শূন্য হয়ে যায়। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলার রীতি অনুযায়ী নেতৃত্বের মর্যাদা এবং যমীনের ব্যবস্থাপনায় কোনো নীতিগত পরিবর্তনও ততক্ষণ পর্যন্ত সাধিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি মধ্যমপন্থী দল (أُمَّةً وَسَطًا) একটি শ্রেষ্ঠ দল (خَيْرَ أُمَّةٍ) জন্ম নেয়। এ দলটি মানুষের উপর সাক্ষী (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। এর জীবন-মরণ হয় স্রেফ আল্লাহ ও তার দীনের জন্য। নৈতিক গুণাবলীর দিক দিয়ে এ দলটি দুনিয়ার সমস্ত দলের ওপরে স্থান লাভ করে।

হকের দাওয়াত একটি বিরাট পরীক্ষা

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আমি একটি কথা বলে দিতে চাই। কোনো মুসলমান জাতির মধ্যে আমাদের এ দাওয়াতের মতো একটি দাওয়াতের আবির্ভাব তাকে একটি সুকঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে। যতক্ষণ হকের কতিপয় বিক্ষিপ্ত অংশ বাতিলের মিশ্রণে সামনে আসতে থাকে, ততক্ষণ একটি মুসলমান জাতির জন্য সেগুলো গ্রহণ না করা এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করার একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। তার ওজর-আপত্তিও গৃহীত হতে থাকে। কিন্তু যখন পূর্ণ হককে একেবারে উন্মুক্ত করে তার স্বরূপে সম্মুখে পেশ করা হয় এবং ইসলামের দাবীদার জাতিকে সেদিকে দাওয়াত দেয়া হয়, তখন মুসলিম জাতির জন্মের এই একমাত্র উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং এর খেদমতের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ানো অথবা একে প্রত্যাখ্যান করে ইতিপূর্বের ইহুদীদের স্থান গ্রহণ করা ছাড়া তার আর গত্যন্তর থাকে না।

এ পরিস্থিতিতে এ দুটি পথ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো পথ সে জাতির জন্য উন্মুক্ত থাকে না। তবে এটা সম্ভব যে, এই দ্ব্যর্থহীন ফয়সালায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে কিছুটা অবকাশ দিতে পারেন এবং পরপর এই ধরনের কয়েকটি দাওয়াতের আবির্ভাব পর্যন্ত এগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব লক্ষ্য করতে পারেন। কিন্তু এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি অবশেষে তাই হবে যা আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি। অমুসলিম জাতির ব্যাপার এ থেকে ভিন্নতর। কিন্তু মুসলমান যদি হককে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে সুস্পষ্ট আহ্বান শুনেও পেছনে ফিরে চলে যায়, তাহলে এটি এমন অপরাধ যার জন্য কোনো নবীর উম্মতকে আল্লাহ মাফ করেননি।

বর্তমানে এ দাওয়াত ভারতে[১] উত্থিত হবার কারণে কমপক্ষে এখানকার মুসলমানদের জন্য পরীক্ষার সেই ভয়াবহ মুহূর্ত সমুপস্থিত হয়েছে। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাবার প্রস্তুতিও আমরা নিচ্ছি। যদি এ প্রচেষ্টায় আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারি, তাহলে যেখানে এ দাওয়াত পৌঁছবে, সেখানকার মুসলমানরাও এ পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। এ দাবী করার কোনো ভিত্তি অবশ্যই আমার কাছে নেই যে, মুসলমানদের জন্য এটি শেষ সুযোগ। একথা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। সম্ভবত এখনো মুসলমানরা হয়তো আরো কিছু সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু কুরআনের ভিত্তিতে আমি অবশ্যই এতটুকু বলতে পারি যে,

১. অর্থাৎ সংযুক্ত ভারত ঃ ১৯৪৭ সালে যে ভারতকে ভারত ও পাকিস্তানে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' এবং ভারতে 'জামায়াতে ইসরামী হিন্দ' এ কাজ করছে।

মুসলমানদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতি। এখানে মুসলমানদের সামনে বর্তমানে দু'ধরনের দাওয়াত আছে। একদিকে আছে আমাদের এই দাওয়াত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সেই কাজের জন্য আহ্বান করছেন যাকে তিনি মুসলিম জামায়াত প্রতিষ্ঠা ও গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গণ্য করেছেন। আর অন্যদিকে ঐসব দাওয়াত আছে যেগুলোর উদ্দেশ্য মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দু'টি বিপরীতধর্মী আওয়াজের মধ্যে দ্বিতীয়টির দিকে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় দলে দলে অগ্রসর হওয়া এবং প্রথম আওয়াজটিকে উম্মতের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে বধির কর্ণে শ্রবণ করা, উম্মতের নেতা, উলামা ও শায়খদের এ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শন, এর প্রকাশ্য ও গোপন বিরোধিতায় তৎপর হওয়া এবং ক্ষুদ্র একটি দলের দিকে অগ্রসর হওয়া- আমার মতে এটি অত্যন্ত খারাপ আলামত। এটি একটি বিরাট বিপদ। মুসলমান জাতি নিজেই নিজেকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করছে। জেনে রাখুন, এ সময়ও যদি এ জাতির মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক এমন লোক না বের হয় যারা মধ্যমপন্থী দল (أُمَّةً وَسَطًا) ও মানুষের উপর সাক্ষী (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) হবার যোগ্য হতে পারে এবং যে কাজের জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিজের যমীনে একটি সৎ ও সংশোধনকারী দলকে সক্রিয় দেখতে চান তা সম্পাদন করতে পারে, তাহলে ঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

"একথা মোটেই সুদূরবর্তী নয় যে, আল্লাহ এমন একটি জাতিকে আনবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসে, যারা ঈমানদারের সঙ্গে নরম এবং কাফিরদের সঙ্গে কঠোর হয়, যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালায় এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করে না। এটি আল্লাহর দান- যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ বিরাট ব্যাপকতার অধিকারী ও জ্ঞানী।" - (আল মায়েদা ঃ ৫৪)

আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন, আপনারা আসলে উম্মতে ওয়াসত-মধ্যমপন্থী উম্মতের পদপ্রার্থী। এই উন্নত স্থান লাভ করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এত বড় পদের প্রার্থী হবার পরও এর উচ্চতা অনুভব না করা এবং এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত

না করা একটি বিরাট অজ্ঞতা। আর এর চাইতেও বড় অজ্ঞতা হলো এই যে, একদিকে আপনারা এখনো বিরাট কাজের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে পারেননি, আবার অন্যদিকে আপনারা তাগিদ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে কোনো বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করার।

আপনারা কি এতটুকুও বুঝেন না এবং এটিকে ভয় করেন না যে, যদি আপনারা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আপনাদের মধ্যে পয়দা না করে থাকেন, তাহলে আপনারা পরাজিত হয়ে পশ্চাদ-পসরণ করবেন এবং এপথে পশ্চাদপসরণ হলো (فِرَارٌ مِنَ الزَّحَافِ) আল্লাহর শরীয়তে যা বিরাট গোনাহ্ বলে গণ্য?

এ দাওয়াতের কাজের জন্য যেসব ব্যক্তিগত ও দলীয় গুণাবলীর প্রয়োজন

এখন আমি আপনাদেরকে বলবো প্রথমত ইসলামী কর্মীদের মধ্যে কি কি সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত একটি সালেহ (সৎ) জামায়াত গঠন করার জন্যে কি কি গুণাবলীর প্রয়োজন। তৃতীয়ত আল্লাহর পক্ষে সংগ্রামকারী মুজাহিদদের জন্য কি কি গুণাবলী অত্যাবশ্যক।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

১. ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে প্রথম ও বুনিয়াদী গুণ হলো এই যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের নফসের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রথমে তাকে মুসলমান বানাবে এবং আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করবে। এ কথাটি হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে ঃ اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ-

"আসলে মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে নিজের নফসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।"

অর্থাৎ বাইরের জগতে আল্লাহদ্রোহীদের মোকাবিলা করার আগে আপনি সেই বিদ্রোহীকে অনুগত করুন যে আপনার ভেতরে রয়েছে এবং আল্লাহর আইন ও তাঁর সন্তুষ্টির বিপক্ষে চলার জন্য হামেশা তাগিদ দিয়ে থাকে। যদি এ বিদ্রোহী আপনার ভিতরে লালিত হতে থাকে এবং আপনার উপর এতখানি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

লাভ করে থাকে যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার নিকট থেকে সে নিজের দাবী আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাইরের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনার যুদ্ধ ঘোষণা একটি অর্থহীন ব্যাপারে পরিণত হবে। এ যেন নিজের ঘরে শরাবের বোতল পড়ে আছে আর বাইরে গিয়ে শরাবীদের সঙ্গে লড়াই করা হচ্ছে। এ বৈপরীত্য আমাদের আন্দোলনের জন্য ধ্বংসকর। নিজে আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনত করুন, অতঃপর অন্যদের কাছ থেকে আনুগত্যের দাবী করুন।

২. জিহাদের পর দ্বিতীয় স্থান হলো হিজরতের। ঘর-বাড়ী ত্যাগ করা হিজরতের আসল অর্থ নয়। আসল অর্থ হলো আল্লাহর নাফরমানী পরিহার করে তাঁর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। আসল মুহাজির তার জন্মভূমিতে আল্লাহর আইন অনুযায়ী জীবন যাপন করার সুযোগ না থাকার কারণে জন্মভূমি ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি জন্মভূমি পরিত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য না করে, তাহলে সে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলো। এ সত্যটিও হাদীসে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস দেখুন। নবী করীমকে স. জিজ্ঞেস করা হলো ঃ اَىُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

"হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ হিজরতটি উত্তম?"

জবাব দিলেন ঃ اَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ

"উত্তম হিজরত হলো তুমি আল্লাহর অপছন্দনীয় যাবতীয় জিনিস পরিহার করো।"

ভেতরের বিদ্রোহী যদি অনুগত না হয়, তাহলে মানুষের নিছক জন্মভূমি পরিত্যাগ আল্লাহর দরবারে কোনো গুরুত্ব রাখে না। এজন্য আমি চাই আপনারা বাইরের শক্তির সঙ্গে লড়াই করার পূর্বে ভেতরের বিদ্রোহী শক্তিগুলোর সঙ্গে লড়াই করুন এবং পারিভাষিক কাফেরদেরকে মুসলমান বানানোর পূর্বে নিজের নফসকে মুসলমান বানান। এ কথাটা আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, নবী করীমের স. হাদীস মোতাবেক নিজেকে ঐ ঘোড়ার মতো করে তৈরি করুন, যাকে একটি মাত্র খোঁটায় বেঁধে রাখা হয়েছে এবং চারিদিকে যতই চলাফেরা করুক না কেন তার দড়ি তাকে যতদূর নিয়ে যেতে দেয় ততদূরই সে যেতে পারে, এর সীমা অতিক্রম করার ক্ষমতা তার নেই ঃ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اَخِيَّتِهِ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى اَخِيَّتِهِ ـ

এহেন ঘোড়ার অবস্থা আজাদ ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হয়। আজাদ ঘোড়া প্রত্যেক ময়দানে ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেক ক্ষেতে প্রবেশ করে এবং যেখানে

সবুজ ঘাস দেখে সেখানেই একেবারে অধৈর্য হয়ে লাফিয়ে পড়ে। আজাদ ঘোড়ার চাল-চলন ও অবস্থা আপনারা নিজেদের মধ্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করুন এবং খোঁটায় বেঁধে রাখা ঘোড়ার অবস্থা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

এ অবস্থা সৃষ্টি করার সাথে সাথেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নিজের নিকটতম পরিবেশের সঙ্গে যাকে আমি বলবো "হোম ফ্রন্ট"- লড়াই শুরু করে দিন। ঘরের লোক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজ-যার সঙ্গে আপনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সবার সঙ্গে সক্রিয় সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। সংঘর্ষ এ অর্থে নয় যে, আপনি নিজের আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেবেন অথবা তাদের সঙ্গে বিতর্ক ও বিবাদে লিপ্ত হবেন। বরং সংঘর্ষ এ অর্থে হওয়া উচিত যে, ব্যক্তি ও জামায়াত হিসেবে আপনি নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে এত বেশী ভালবাসুন এবং নিজের নীতি-নিয়মের এত বেশী অনুগত হয়ে পড়ুন যে, আপনার আশেপাশে যে সব লোক কোনো আদর্শ ও লক্ষ্য ছাড়া নীতিহীন জীবন যাপন করছে তারা যেন আপনার নিয়মানুগ জীবন যাত্রাকে বরদাশত করতে না পারে। আপনার স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই আপনার বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়।

আপনার নিজের শহরেই আপনি আগন্তুকে পরিণত হয়ে যান। জীবিকা উপার্জনের জন্য আপনি যেখানে কাজ করেন, সেখানে আপনার অস্তিত্ব সবার চোখে খচখচ করে বিঁধুক। অফিসের যে আরাম কেদারায় বসে প্রতিপত্তি ও উন্নতির স্বপ্ন দেখা হয়, তা আপনার জন্য জ্বলন্ত আগুনের চুল্লি বনে যাক।

সার কথা হলো, যে যত বেশী নিকটের তার সঙ্গে তত বেশী সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়া উচিত। যে ব্যক্তির ঘরেই জিহাদের ময়দান থাকে, সে আবার কয়েক মাইল দূরেই বা কেন লড়াই করতে যাবে। প্রথম লড়াই তো ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। এত দিনে যে সব জায়গা থেকে এই সংঘর্ষের খবর পৌঁছুচ্ছে সেখানকার লোকদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি এবং যে সব জায়গা থেকে এ ধরনের খবর এখনো পৌঁছেনি, সেখান থেকে এ ধরনের খবর শুনবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছি।

তবে আমি এই মুহূর্তে একথা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, এ সংঘর্ষ ঠিক সেই মানসিকতার সঙ্গে চালানো উচিত, যে মানসিকতা নিয়ে একজন ডাক্তার রোগীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়। আসলে তিনি রোগীর সঙ্গে লড়াই করেন না, লড়াই করেন রোগের সঙ্গে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা হয় সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি যদি রোগীকে তিক্ত ওষুধ সেবন অথবা তার শরীরে অস্ত্রোপচার করেন, তাহলেও এ হয় পুরোপুরি আন্তরিকতাপ্রসূত, শত্রুতাপ্রসূত নয়।

তার ঘৃণা অথবা রাগ সবটুকুন হয় রোগের বিরুদ্ধে, রোগীর বিরুদ্ধে নয়। ঠিক এভাবেই আপনার একজন গোমরাহ্ ভাইকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। কোনো কালেও কারোর কথায় যেন তার মনে এ অনুভূতি না জাগে যে, তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে অথবা সরাসরি তার সঙ্গে শত্রুতা করা হচ্ছে। বরং সে যেন আপনার মধ্যে মানবিক সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে ক্রিয়াশীল দেখতে পায়। দ্বারভাঙ্গা সম্মেলনেও আমি সংক্ষেপে একথা বলেছিলাম যে, বক্তৃতা এবং লেখার মাধ্যমে বিতর্ক চালিয়ে সত্যিকার তাবলীগ করা যায় না। এগুলো হলো কাজ করার অ-উৎকৃষ্ট ও নিম্নপর্যায়ের পদ্ধতি।

আপনি নিজের দাওয়াতের মূর্তিমান প্রকাশ ও নমুনা হবেন, এটিই হলো আসল তাবলীগ। যেখানেই মানুষের দৃষ্টিসমক্ষে এ নমুনার প্রকাশ ঘটবে, সেখানেই আপনার কার্যধারা প্রত্যক্ষ করে তারা সনাক্ত করবে যে, ইনিই আল্লাহর পথের পথিক। যেমন কোনো "কংগ্রেসে আত্মলীন" ব্যক্তির সামনে এলেই কংগ্রেস-বাদের পূর্ণ চিত্র দৃষ্টি সমক্ষে ভেসে ওঠে। অনুরূপভাবে আপনি এমন "ইসলামে আত্মলীন" হয়ে যান, যার ফলে যেখানেই আপনি দৃষ্টিগোচর হন, সেখানেই যেন ইসলামী আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র ভেসে ওঠে। এ জিনিসটাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেছেন ঃ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ

"অর্থাৎ তাদেরকে দেখলে যেন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"

আমি বলছি না যে, এমুহূর্তেই এমনি হয়ে যাওয়া উচিত। এ মর্যাদা পর্যায়ক্রমে হাসিল হবে। আল্লাহর পথে নিজের পরিবেশের সঙ্গে যখন আপনার সংঘর্ষ চলতে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে, প্রতি লহমায় নিজের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টায় আপনি কুরবানী দিতে থাকবেন, তখন একটি বিশেষ সময়ে উপনীত হয়ে আপনার মধ্যে আত্মলীনের অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং আপনি নিজের দাওয়াতের মূর্তিমান নমুনায় পরিণত হবেন।

এই উদ্দেশ্যে গভীর দৃষ্টিতে কুরআন-হাদীস বারবার অধ্যয়ন করুন। লক্ষ্য করুন, ইসলাম কোন্ ধরনের মানুষ চায় এবং নবী করীম স. কোন্ প্রকৃতির মানুষ গঠন করতেন। এ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ গুণাবলী সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তারপর জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করা হয়েছিল।

আপনারা সবাই জানেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পবিত্রাত্মা স. যে মানুষ তৈরি করেছিলেন, তাদেরকে ১৫ বছর প্রস্তুতির পর কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছিল। এ প্রস্তুতির বিস্তারিত ঘটনা অবগত হোন এবং লক্ষ্য করুন। এ কাজ কিভাবে পর্যায়ক্রমে সাধিত হয়েছিল। এর মধ্যে কোন্ গুণাবলীকে প্রথমে লালন করা হয়েছিল এবং কোন্গুলিকে পরে। কোন্ গুণাবলী কোন্ পর্যায়ে অর্জন করা

হয়েছিল এবং তাকে কতদূর তরক্কি দেওয়া হয়েছিল এবং কোন্ পর্যায়ে উপনীত হবার পর আল্লাহ তা'আলা এ জামায়াতকে বলেছিলেন যে, এখন তোমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছো এবং মানব জাতির সংশোধনের কাজে বের হবার মতো যোগ্যতা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। এ নমুনা নিজের প্রস্তুতির জন্যও আপনার সম্মুখে থাকা উচিত।

বিস্তারিত বর্ণনা করার সুযোগ এখানে নেই। আপনাদের পথ প্রদর্শনের জন্য মাত্র দুটি হাদীস এখানে বিবৃত করছি। এ থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে, এ কাজের জন্য কোন্ গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন। নবী করীম স. বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ـ

"অর্থাৎ মানুষ পূর্ণ মু'মিন তখন হয়, যখন তার অবস্থা এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তার বন্ধুত্ব-শত্রুতা, তার দেয়া-না দেয়া সবকিছুই নির্ভেজালরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। পার্থিব ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রেরণা তার জন্যে খতম হয়ে যায়।"

দ্বিতীয় হাদীসটিতে নবী করীম স. বলেন ঃ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ

আমার প্রতিপালক আমাকে ন'টি জিনিসের হুকুম দিয়েছেন ঃ

خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ـ

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন আমি আল্লাহকে ভয় করতে থাকি।

وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا ـ

২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় ইনসাফের কথা বলি।

وَالْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ ـ

৩. দারিদ্র্য ও বিত্তশালিতা যে কোন অবস্থায়ই যেন আমি সততা ও মধ্যমপন্থার ওপর কায়েম থাকি।

وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ ـ

৪. যে আমার থেকে কেটে গেছে তাকে যেন আমি জুড়ে নেই।

وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ

৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে আমি দান করি।

وَاَعْفُوْ مَنْ ظَلَمَنِىْ ـ

৬. আমার উপর যে জুলুম করে তাকে যেন আমি মাফ করি।

وَاَنْ يَكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا

৭. আমার নীরবতা যেন চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়।

وَنُطْقِىْ ذِكْرًا

৮. আমার কথাবার্তা যেন আল্লাহর স্মরণমূলক হয়।

وَنَظْرِىْ عِبْرَةً

৯. এবং আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষার দৃষ্টি হয়।

এই কাংখিত গুণাবলীর কথা উল্লেখ করার পর নবী করীম স. বলেছেন,

وَاَنْ اٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ

"অর্থাৎ আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে সৎকাজের নির্দেশ দেবার অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার।"

এ থেকে জানা যায়, সৎকাজের প্রসার ও অসৎকাজকে খতম করার জন্য যে মধ্যমপন্থী উম্মত সৃষ্টি করা হয়েছে, তার প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এ গুণাবলী থাকা উচিত। এই গুণাবলী সংযোগেই ঐ কর্তব্য সম্পাদিত হতে পারে। এগুলো না হলে আমরা কখনো আমাদের দাওয়াতের চাহিদা পূর্ণ করতে পারি না।

দলীয় গুণাবলী

এতো গেল ব্যক্তিগত সংস্কার সাধনের কর্মসূচি। এরপর দলীয় ভিত্তিতে অন্যান্য কতিপয় নৈতিক গুণাবলীর প্রয়োজন। দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হলো জামায়াত সদস্যের ভালবাসা ও সহানুভূতির। পারস্পরিক সু-ধারণা, অনাস্থার পরিবর্তে আস্থা, এবং পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতার। এই সঙ্গে পরস্পরকে হক-এর নসিহত করার অভ্যাস, নিজে অগ্রসর হওয়ার এবং অন্যকে নিজের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর করার প্রয়োজন।

এ গুণাবলী প্রত্যেক দলীয় সংগঠনের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যথায় পৃথক পৃথকভাবে যদি সবাই উচ্চ পর্যায়ে সৎগুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয় কিন্তু সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ না হয়, পরস্পরের সহযোগী না হয়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

চলতে না পারে, তাহলে দুনিয়ায় বাতিলের ধারকদের আমরা তিলমাত্রও ক্ষতি করতে পারবো না।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে উত্তম মানুষ হামেশা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আজও আছে। আর আজ যদি সমগ্র দুনিয়াকে আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি যে, এমন লোক আর কারো কাছে নেই, তাহলে সম্ভবত এ চ্যালেঞ্জের জবাব কোনো জাতি দিতে সক্ষম হবে না। কিন্তু এ ব্যাপারটি শুধু ব্যক্তিগত সংস্কার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেসব লোক নিজেদের ব্যক্তি চরিত্রে পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তারা বড় জোর কয়েকশত বা কয়েক হাজার লোকের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত করতে পেরেছেন এবং পবিত্রতার কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন রেখে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এটি কোনো মহত্তম কাজ করার পদ্ধতি নয়। যে শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান ভারী বোঝা উঠাবার এবং মল্লযুদ্ধে বহু ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করার ক্ষমতা রাখে, সে একটি সুসংবদ্ধ সেনাদলের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। অনুরূপভাবে আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক যদি ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধি হাসিল করেন, তাহলে তাদের অবস্থা ঠিক সেই পাহলোয়ানের মতো, যে কোন সেনাদলের অঙ্গ হিসাবে কাজ করে না বরং একাই একটি সেনাদলকে যুদ্ধে আহ্বান করে। ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির দিক দিয়ে আমাদের নিজেদের জামায়াতের এমন রফিকের সংখ্যা কম নয় যাদের অবস্থা দেখে আমার নিজেরই ঈর্ষা হয়। কিন্তু জামায়াতী পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

কুরআনে এ বিষয় সম্পর্কে নীতিগত পর্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে এবং হাদীসে নীতিগুলোর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা রয়েছে। অতঃপর নবী করীমের স. সীরাত এবং সাহাবা কিরামের জীবনী অধ্যয়ন করে ঈপ্সিত জামায়াতী চরিত্রের পুঁথিগত নমুনাও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। এ জিনিসগুলো ঘেঁটে পরিমাপ করে দেখুন, কোন্‌দিক দিয়ে আমাদের জামায়াতী সংগঠনে কি এবং কতটুকু কমতি আছে। অতঃপর এ কমতি পুরা করার চিন্তা করুন।

পরিষ্কার কথা হলো এই যে, সামষ্টিক সংগঠনে অবশ্যই এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তিবর্গের মুখোমুখি হতে হয়। এ ক্ষেত্রে যদি সু-ধারণা, সহানুভূতি, ত্যাগ ও কল্যাণ কামনার মনোভাব না থাকে, তাহলে মেজাজ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা সহযোগিতাকে চারদিনও তিষ্ঠাতে দেবে না। জামায়াতী সংগঠন এ নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে যে, অন্যদের জন্য আপনি নিজের কিছুটা ত্যাগ করবেন এবং অন্যরাও আপনাদের জন্য কিছুটা ত্যাগ করবে। এ ত্যাগের হিম্মত যদি না থাকে, তাহলে কোনো বিপ্লবের নাম মুখে আনা উচিত নয়।

আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা-সাধনা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী

যে গুণাবলীকে আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা হয়, কুরআন ও হাদীসে এগুলোরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শুধু বর্ণনাই নয়, এক একটি প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সেটি কোন্ ধরনের এবং কোন্ পর্যায়ের হওয়া উচিত। এ সম্পর্কিত আহকাম ও নির্দেশাবলী একত্র করে চিন্তা করুন, আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা-সাধনা চালাবার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমি সংক্ষেপে এদিকে একটু ইঙ্গিত করতে চাই।

১. সর্বপ্রথম যে গুণটির উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে সেটি হলো সবর। সবর ছাড়া শুধু আল্লাহর পথেই বা কেন- কোনো পথেই প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব নয়। পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, আল্লাহর পথে যে ধরনের সবরের প্রয়োজন দুনিয়ার ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা করার জন্য প্রয়োজন তা থেকে ভিন্ন ধরনের সবরের। কিন্তু সবর যে অত্যাবশ্যক, একথা অনস্বীকার্য। সবরের অনেকগুলো দিক আছে।

একটি দিক হলো, তাড়াতাড়ি কোনো কার্য সম্পাদন থেকে বিরত থাকা।

দ্বিতীয় হলো, কোনো পথে চেষ্টা করার সময় বাধা-বিপত্তি, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখানো এবং একপাও পিছিয়ে না যাওয়া।

তৃতীয় দিকটি হলো, প্রচেষ্টার কোনো ত্বরিত ফলাফল প্রকাশিত না হলেও হিম্মতহারা না হওয়া এবং অনবরত প্রচেষ্টা জারি রাখা।

এর আর একটি দিক হলো এই যে, উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বৃহত্তম বিপদ, ক্ষতি, ভীতি ও লোভের মোকাবিলায়ও পা পিছলিয়ে না যাওয়া।

সবরের একটি শাখা হলো এই যে, ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেও মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে না, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। সর্বদা ধৈর্য, সঠিক বিবেক এবং স্থির ফয়সালা শক্তিকে কাজে লাগাবে।

আবার শুধু সবর করারই হুকুম দেয়া হয়নি বরং সবরের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ বিরোধী শক্তিরা নিজেদের বাতিল উদ্দেশ্যের জন্য যেভাবে সবরের সঙ্গে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ঠিক অনুরূপ সবরের সঙ্গে আপনারাও দৃঢ়ভাবে তাদের মোকাবিলা করবেন। এই জন্যই صَابِرُوْا এর সঙ্গে اِصْبِرُوْا এর হুকুমও দেওয়া হয়েছে।

যেসব লোকের মোকাবিলায় আপনারা হকের ধারক হিসেবে অগ্রসর হবার দাবী করেন আপনাদের সবরের সঙ্গে তাদের সবরের তুলনা করুন এবং চিন্তা করুন

আপনাদের সবরের তুলনামূলক হার কত। সম্ভবত তাদের তুলনায় আমরা শতকরা দশ ভাগের দাবী করার যোগ্যতাও রাখি না। বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সবর তারা দেখাচ্ছেন বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে তা আন্দাজ করা যেতে পারে।

কিভাবে সংগীন মুহূর্তে তারা নিজেদের কারখানা, শহর এবং রেল স্টেশনগুলোকে স্বহস্তে ধ্বংস করে ফেলেছে- যেগুলো নির্মাণে বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে মেহনত করতে এবং অজস্র অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। তারা সেই সব ট্যাংকের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যায় যেগুলো সৈন্যদেরকে লৌহচক্রের তলায় পিষে মেরে ফেলে। মৃত্যুর ডানা লাগিয়ে যেসব বোমারু বিমান উড়ে বেড়ায় তাদের ছায়ায় তারা স্থিরচিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ না তাদের মোকাবিলায় আমাদের সবর শতকরা ১০৫ হারে উপনীত হয়, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সংগ্রাম চালাবার সাহস করা যেতে পারে না। সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়ে যখন তাদের মোকাবিলায় আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই, তখন এই সাজ-সরঞ্জামের অভাবকে একমাত্র সবরের দ্বারাই পূর্ণ করা যেতে পারে।

২. প্রচেষ্টা-সাধনার জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণটি হলো ত্যাগ ও কুরবানী। সময়ের কুরবানী, মেহনতের কুরবানী, অর্থের কুরবানী।

কুরবানীর দিক দিয়েও বাতিলের ঝাণ্ডাবাহী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় আমরা অনেক পেছনে রয়ে গেছি। অথচ সাজ-সরঞ্জামের অভাব পূরণ করার জন্য কুরবানীর ক্ষেত্রেও আমাদেরকে তাদের চাইতে অনেক অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে অবস্থা হলো এই যে, এক ব্যক্তি বিশ, পঞ্চাশ, একশো এবং হাজার টাকা মাসিক বেতনের বিনিময়ে নিজের সমস্ত যোগ্যতা নিজেই দুশমনের হাতে বিক্রি করে এবং এভাবে আমাদের জাতির কার্যকর অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এই বুদ্ধিগত যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রেণীটি মোটা অংকের একটা আয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে নিছক প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে স্বল্প বেতনে নিজেদের খেদমত পেশ করার হিম্মতই রাখে না। তাহলে বলুন, এরা যদি এতটুকু কুরবানী না করে এবং এ পথে শেষ শক্তি নিয়োগ করে কাজ করতে না পারে, তাহলে ইসলামী আন্দোলন কেমন করে সম্প্রসারিত হতে পারে? বলা বাহুল্য, নিছক স্বেচ্ছাসেবক নির্ভর হয়ে কোনো আন্দোলন কামিয়াব হতে পারে না।

জামায়াতী ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকদের গুরুত্ব ঠিক সে পর্যায়ের যে পর্যায়ের গুরুত্ব আছে একটি মানুষের শারীরিক ব্যবস্থায় তার হাত ও পায়ের। এই হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি কাজ করতে পারে যদি তাদের থেকে কাজ নেবার জন্য স্পন্দিত দিল্ এবং চিন্তাশীল মস্তিষ্ক না থাকে? অন্য কথায় বলা যায়,

স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাবার জন্য আমাদের প্রয়োজন উন্নত পর্যায়ের সেনাপতি। কিন্তু বিপদ হলো এই যে, যাদের নিকট মন ও মস্তিষ্কের শক্তি আছে তারা পার্থিব উন্নতি লাভে মশগুল। মার্কেটে তারা তারই দিকে যায় যে বেশী দাম পেশ করে। আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের সম্পর্ক এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যার জন্য তারা নিজেদের লাভ বরং লাভের সম্ভাবনাকে কুরবানী করতে পারে।

এই কুরবানী সম্বল করে যদি আপনারা আশা করেন যে, দুনিয়ার যেসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা এবং লাখো লাখো প্রাণ উৎসর্গ করছে, তারা আমাদের নিকট পরাস্ত হতে পারে, তাহলে এ হবে ছোট মুখে বড় কথা।

৩. আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় গুণ হলো হৃদয়ের একাগ্রতা। কোনো ব্যক্তি যদি নিছক চিন্তার ক্ষেত্রে এ আন্দোলনকে বুঝে নেয় এবং শুধু বুদ্ধিগত দিক দিয়ে এর উপর নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে এ পথে পদ সঞ্চারের জন্য এটি হবে শুধুমাত্র তার প্রাথমিক পদক্ষেপ। কিন্তু শুধু এতটুকুতেই কাজ চলতে পারে না। এখানে প্রয়োজন হলো মনের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠার। বেশী না হলেও কমপক্ষে এতটুকুন আগুন জ্বলে ওঠা উচিত, যতটুকুন নিজের ছেলেকে অসুস্থ দেখার পর জ্বলে ওঠে এবং আপনাকে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য করে। অথবা ঘরে অন্ন না থাকলে যতটুকুন আগুন মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, মানুষকে বাধ্য করে চেষ্টা সাধনা করতে এবং এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না।

বুকের মধ্যে সেই আবেগ থাকা উচিত, যা হর-হামেশা আপনাকে আদর্শ ও লক্ষ্যের ধ্যানে মশগুল রাখবে, মন ও মগজকে একাগ্র করবে এবং আপনার লক্ষ্যকে একাজের মধ্যে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করবে যে, যদি ব্যক্তিগত, সাংসারিক অথবা অন্য কোন অসম্পর্কিত ব্যাপার কখনো আপনার দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেও থাকে, তাহলে প্রবল অনিচ্ছার সঙ্গে যেন আপনি সেদিকে আকৃষ্ট হন।

চেষ্টা করুন নিজের সত্তার জন্য শক্তি ও সময়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করার। তবে আপনার সর্বাধিক প্রচেষ্টা হবে জীবনোদ্দেশ্যের জন্য। যতক্ষণ না হৃদয় একাজে পুরোপুরি মগ্ন হবে এবং আপনি সর্বান্তকরণে নিজেকে একাজের মধ্যে সঁপে দিতে পারবেন, ততক্ষণ নিছক মৌখিক জমা-খরচে কিছুই হবে না। অধিকাংশ লোক চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করতে অগ্রসর হন, কিন্তু অতি অল্প লোকই পাওয়া যায়- যারা মনকে পুরোপুরি মশগুল করে দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে একাজে অংশগ্রহণ করে।

আমার জনৈক নিকটবর্তী সহযোগী- যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও জামায়াতী সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর-সম্প্রতি দু'বছরের সহযোগিতার পর আমার নিকট স্বীকার করেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত আমি নিছক মানসিক নিশ্চিন্ততার জন্য জামায়াতে শামিল ছিলাম কিন্তু বর্তমানে এ জিনিসটি আমার মনের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং আমার আত্মার গভীরতম প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব জমিয়ে বসেছে।

আমি চাই প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবেই আত্মসমালোচনা করে দেখবেন যে, এখনো পর্যন্ত কি তিনি নিছক চিন্তার ক্ষেত্রেই জামায়াতের একজন সদস্য রয়ে গেছেন অথবা তার দিলে উদ্দেশ্য-প্রেমের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। অতঃপর যদি নিজের মধ্যে হৃদয়ের মগ্নতা থাকে তাহলে সেখানে কোনো ধাক্কা দেবার অথবা উস্কানি দেবার প্রয়োজন হয় না। এ শক্তির উপস্থিতিতে কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে না যে, যদি কোথাও জামায়াতের একজন সদস্য পেছনে সরে আসেন অথবা স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন, তাহলে সেখানকার সমস্ত কাজই ওলট-পালট হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ছেলের পীড়িতাবস্থায় যেভাবে কাজ করে থাকে ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত কাজই করে যাবে।

আল্লাহ না করুন যদি আপনার ছেলে কখনো পীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে তার জীবন-মরণ সমস্যাকে আপনি পুরোপুরি কখনো অন্যের উপর ছেড়ে দিতে পারেন না। আপনি কখনো এ ওজর পেশ করে তাকে তার নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে পারেন না যে, সেবা-শুশ্রূষা করার মত কেউ নেই, ওষুধ আনার লোক নেই, ডাক্তারের নিকট যাবার মতো লোকও নেই। কেউ না থাকলে আপনি একাই সব কিছু করবেন। কেননা ছেলে কারোর নয়, আপনার নিজেরই। বৈমাত্রেয় পিতা তবু ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু আসল পিতা নিজের কলিজার টুকরাকে কেমন করে ছেড়ে দিতে পারে! তার দিলে তো আগুন লেগে যায়।

অনুরূপভাবে এ কাজের সঙ্গেও যদি আপনার মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে একে আপনি অন্যের উপর ছেড়ে দিতে পারেন না। আবার এমনও হতে পারে না যে, অন্য কারোর অযোগ্যতা, ক্রটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অবহেলার বাহানা দেখিয়ে আপনি নিজে এর ধ্বংসের পথ খোলাসা করে নিজের অন্যান্য কাজে মশগুল হবেন। এসব কাজ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দীন এবং তার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেহায়েত একটি বৈমাত্রেয় সম্পর্ক। আসল সম্পর্ক যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেই এপথে প্রাণপণ করে কাজ করে যান।

আমি স্পষ্ট করে আপনাদের বলছি যে, এপথে যদি আপনারা কমপক্ষে আপনাদের স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যতটুকুন মানসিক সম্পর্ক রাখেন, ততটুকুন সম্পর্ক ছাড়া এগিয়ে

আসেন, তাহলে পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই নসীবে নেই এবং এও এমন নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশ্চাদপসরণ হবে যে, এরপর কয়েক যুগ পর্যন্তও আমাদের বংশধররা এই আন্দোলনের নাম উচ্চারণ করারও সাহস করতে পারবে না। বৃহত্তর পদক্ষেপের নামোচ্চারণ করার আগে নিজের মানসিক ও নৈতিক শক্তির পরিমাপ করুন এবং আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য যে হৃদয়বত্তার প্রয়োজন তা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন।

৪. এপথে প্রচেষ্টা চালাবার জন্য চতুর্থ প্রয়োজনীয় গুণ হলো এই যে, আমাদের অনবরত ও উপর্যুপরি প্রচেষ্টা চালাবার এবং নিয়মতান্ত্রিক (Systematic) পদ্ধতিতে কাজ করার অভ্যাস থাকতে হবে। সুদীর্ঘকাল থেকে আমাদের জাতি এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, কোনো কাজ করতে হলে সবচাইতে কম সময়ের মধ্যে করতে হবে এবং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই হৈ-চৈ করতে হবে। তাতে মাসেক-দু'মাসের মধ্যে সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। আমাদের এ অভ্যাস বদলাতে হবে। এর পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে এবং হৈ-হল্লোড় না করেই কার্য সম্পাদন করার নকশা তৈরি করতে হবে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ভারও যদি আপনার উপর দেয়া হয়, তাহলে কোনো বড় রকমের এবং ত্বরিত ফল লাভ ছাড়া কোনো বাহবার প্রত্যাশা না করেই আপনি ধৈর্যের সঙ্গে নিজের সমগ্র জীবন এর পেছনে লাগিয়ে দিন। আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনায় হর-হামেশা লড়াই জারি থাকে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তিও প্রথম সারিতে লড়াই করতে পারে না। এক সময়ের লড়াইয়ের জন্য কখনো কখনো পঁচিশ বছর ধরে নীরব প্রস্তুতি চালাতে হয় এবং প্রথম সারিতে যদি কয়েক হাজার ব্যক্তি লড়াই করে, তাহলে পেছনের সারিগুলোর লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়, যা বাহ্য দৃষ্টিতে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়।

যেসব কাজ করতে হবে

বক্তৃতা শেষ করার আগে বর্তমানে আমাদের সম্মুখে যে কর্মসূচি রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করার প্রয়োজন মনে করি। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে কর্মসূচি সামনে রেখে আমি আন্দোলনকে পরিচালিত করছি, তাকে সঠিকভাবে বুঝে নেয়া হয়নি।

প্রথম কাজ

সর্বপ্রথম কাজ যেজন্য এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাহলো এই যে, আপনাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়ে যাবো। আমি ভালভাবে জেনে নিতে চাই, কোন্ কোন্ গুণসম্পন্ন লোক আমার সঙ্গে চলছে। তাদের মধ্যে কি কি যোগ্যতা ও শক্তি আছে। তাদের দ্বারা কি কি কাজ নেয়া যেতে পারে। আপনারা আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আপনারা কি কি কাজ সম্পাদন করতে পারেন। যত শীঘ্রই আমি এসব জানতে পারবো, তত শীঘ্রই কাজের নক্‌শা তৈরি করতে সক্ষম হবো। শক্তির পরিমাপ না করেই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমার মতে ভাল নয়। এ উদ্দেশ্যে আপনারা বারবার কেন্দ্রে আসতে থাকুন এবং চিঠি-পত্র মারফত আমাকে জানাতে থাকুন। যতদূর সম্ভব নিজেও সভা-সম্মেলনে হাজির থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরো বাড়াতে থাকবো। এরপর কাজের একটা পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার কথা চিন্তা করবো।

দ্বিতীয় কাজ

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কাজ হলো– কর্মীদেরকে ট্রেনিং দেবার জন্য আমাদের এমন একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা প্রয়োজন মতো লোক তৈরি করতে এবং নিজেদের কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারবো। আগামীকাল যেসব প্রস্তাব পেশ করা হবে, তা থেকে আপনারা জানতে পারবেন, এ ব্যাপারে আমরা খুব শিগগির পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

তৃতীয় কাজ

তৃতীয় কাজ- যেদিকে বহুদিন থেকে সরাসরি এবং চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও বারবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং যার অত্যধিক গুরুত্ব আমি নিজেও

অনুভব করছি তা হলো এই যে, ভবিষ্যত বংশধরদের আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আন্দোলনের খেদমতের জন্য তৈরি করা। এতদিন থেকে অর্থ, যোগ্য কর্মীর অভাব এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। কিন্তু সম্ভবত এ ব্যাপারে এখন আর বেশী বিলম্ব হবে না এবং অতিসত্বর আপনারা শুনবেন যে, কেন্দ্রে এ কাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। কাজেই আমি সুখবর শুনাচ্ছি যে, মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এ উদ্দেশ্যেই এখানে তাশরীফ এনেছেন। স্থায়ীভাবে তিনি এখানে থেকে যেতেও পারেন।

চতুর্থ কাজ

চতুর্থ যে বিষয়টির জন্য আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, তা হলো এই যে, মেয়েদেরকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের একটি হাতই শুধু কাজ করে যাচ্ছে এবং গাড়ীর একটি চাকাই শুধু আন্দোলিত হচ্ছে। এখন আমাদের অন্য হাতটির এবং গাড়ীর অন্য চাকাটির ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত।

বলাবাহুল্য, আমাদের মহিলাদের সঙ্গে আমাদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। তারা আমাদের দ্বারা এবং আমরা তাদের দ্বারা সব সময় প্রভাবিত হই। কাজেই আমরা যদি তাদের সংশোধনের চিন্তা না করি, তাহলে আমাদের নিজেদের সংশোধনও অপূর্ণ থেকে যাবে। গৃহ-প্রাঙ্গণকে মুসলমান না বানিয়ে আমরা দুনিয়াকে মুসলমান বানাতে পারবো না।

এ ব্যাপারে সমস্যাটাই হলো এই যে, মেয়েদের সঙ্গে আমরা সরাসরি ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি না। এজন্য মেয়েদের কাছ থেকেই সাহায্য নিতে হবে। যে সব জাতি শরীয়তের বিধি-নিষেধমুক্ত, তাদের ব্যাপার সহজ। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য নিজেদের মেয়েদেরকে বাজার, কারখানা, স্কুল-কলেজ, মাঠ ও ময়দানে বেধড়ক নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটি একটি নাজুক সমস্যা এবং এর সমাধানের জন্য বেশ বুদ্ধি খরচ করতে হবে।

পঞ্চম কাজ

পঞ্চম কাজ হলো– জনমত তৈরি করার জন্য ব্যাপক হারে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এতদিন জনগণকে আমরা সরাসরি আহ্বান জানাইনি। একারণেই এতদিন ঐ সমুদ্রের একটিমাত্র কোণেই আমরা কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে

পেরেছি। এখন আমাদের ধীরে ধীরে আসল সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সমগ্র জনসমষ্টি যে আমাদের সদস্য হয়ে যাবে তেমন কোন কথা নেই।

দেশের জনসমাজের একটি বিপুল অংশের হককে হক বলে মেনে নেয়া, আমাদের উদ্দেশ্যের নির্ভুলতার স্বীকারোক্তি করা এবং আমাদের নৈতিক প্রভাব তাদের উপর কায়েম হয়ে যাওয়াটাই আমাদের দাবীর জন্য যথেষ্ট। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, এরপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো তাতে আমরা জনগণের সহানুভূতি পাবো।

এতদিন আমাদের বই-পত্রে জনগণের জীবন সমস্যার একটা সামান্য অংশই আলোচিত হয়েছে এবং তাও বেশীর ভাগ সংক্ষিপ্ত ইশারার মাধ্যমে। অথচ এযুগে জীবনের প্রত্যেকটি দিকের উপর আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা উচিত। বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞানকে নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত। একাজ শুধু একটি দু'টি ভাষায় নয়, বিভিন্ন ভাষায় করা উচিত- যাতে করে খুব বেশী সংখ্যক লোক আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কাজেই এক্ষেত্রেও এখন আমাদের প্রচেষ্টার পরিসরকে আরো ব্যাপক করতে হবে।

তাছাড়া এতদিন প্রচারের জন্য আমরা শুধুমাত্র লেখার মাধ্যমকে যথেষ্ট মনে করেছি। বক্তৃতার মাধ্যমকে আমরা এখনো ব্যবহার করিনি। এখন আমাদের এ দিকে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এজন্য আমাদের বক্তৃতার নতুন টেকনিক গ্রহণ করতে হবে। লোক দেখানো এবং হৈ-হল্লোড় ভিত্তিক বক্তৃতা মঞ্চ থেকে দূরে থাকতে হবে। দায়িত্বপূর্ণ কথা বলার অভ্যাস করতে হবে। এভাবে আমাদের দিক থেকে যে আওয়াজই বুলন্দ হবে তা যেন এত বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যশালী হয় যে, তার ফলে লোক তাকে বে-লাগাম ও হুল্লোড়বাজ বক্তাদের বাদ্যযন্ত্রের অসংখ্য সুরের মধ্যে একটি সুর মনে না করে।

এতদিন পর্যন্ত আমার সহযোগীদেরকে আমি বক্তৃতা থেকে এজন্যই বিরত রেখেছি যে, পুরাতন অভ্যাসের প্রভাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে এবং আমি ভয় করি যেন ঐ পুরাতন ধরনের বক্তৃতা আমরা শুরু করে না দেই যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নামোচ্চারণকারীদের মুখে কোনদিন শোভা পায় না। চিন্তাধারা প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম আপনারা ব্যবহার করুন, এটা আমি চাই। কিন্তু এর প্রথম শর্ত হলো এই যে, সেগুলোকে ইসলামী নৈতিকতার অনুগত করুন এবং বে-লাগাম লোকেরা তার মধ্যে যে সব অসৎ উপাদান সংযোজিত করেছে তা থেকে সেগুলোকে পাক করুন।

এ জরুরী কথাগুলো আমি আপনাদের কর্ণগোচর করতে চাচ্ছিলাম। আপনারা এর উপর চিন্তা করুন এবং জরুরী পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। এখন আমি দোয়া করছি যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিজেদের শপথের দায়িত্ব বুঝবার ও আদায় করার সুযোগ দেন। আমাদের নিয়তের মধ্যে আন্তরিকতা ও আমাদের ঈমানের শক্তি দান করেন। আমাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন। আমাদের সামান্য কাজকে কবুল করে নেন এবং বেশী কাজ করার হিম্মত দান করেন। আমাদের স্বপক্ষে তাঁর সেই সব বান্দার সমর্থন দান করেন, যাঁরা আমাদের চাইতে উন্নত ও গুণাবলীর অধিকারী এবং আমাদের চাইতে বেহতের পদ্ধতিতে দীনের খেদমত করতে পারেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

২৭ মার্চ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন জামায়াতের স্থানীয় কার্যাবলীর রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। কাজেই বিভিন্ন জামায়াতের প্রতিনিধিগণ বিস্তারিতভাবে নিজেদের কাজ ও কাজের পথে বাধা-বিপত্তিসমূহের রিপোর্ট পেশ করেন। এসব রিপোর্ট পেশ করার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সদস্যকে জানিয়ে দেয়া যে, কাজ কোথায় কিভাবে ও কোন্ পদ্ধতিতে হচ্ছে এবং এর মোকাবিলায় কোথায় লোকেরা কতটা পেছনে রয়েছে। বিভিন্ন সহযোগী কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সেগুলোকে কিভাবে অতিক্রম করা হচ্ছে। রিপোর্টের এ উদ্দেশ্যকে আমীরে জামায়াত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন।

অতঃপর আমীরে জামায়াতের ইঙ্গিতে মওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী এর উপর মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অনেক মূল্যবান হিদায়াত ও পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তৃতা নীচে দেওয়া হলো।

মওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর বক্তৃতা

বন্ধুগণ!

আপনাদের রিপোর্ট শুনার মধ্যে এত বেশি বেশি মশগুল ছিলাম যে, এর বিভিন্ন দিকের উপর মন্তব্য করার জন্য যতটুকুন চিন্তা করার প্রয়োজন ততটুকুন চিন্তা করার সুযোগই আমি পাইনি। তবুও কয়েকটি কথায় আমার মনে খটকা লেগেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের নির্দেশক্রমে আমি কিছু বলতে চাই। আপনাদের কার্যাবলী এবং এ সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্যান্য দলের সঙ্গে সম্পর্ক ও সংঘর্ষের ব্যাপারে সংশোধনের অনেকটা অবকাশ রয়েছে, তাই আমি এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই।

সত্য প্রচারের পথে বাধার প্রতিষেধক

আপনারা যে সব বাধা-প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করেছেন, এ পথে অনিবার্যভাবেই সেগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু এর নির্ভুল প্রতিষেধকের অনুসন্ধান থেকে আমাদের গাফেল থাকা উচিত নয়। সঠিক পদ্ধতিতে সত্য ও ন্যায়ের কার্য পরিচালনাকারীদেরকে অবশ্যই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে অন্যের সঙ্গে খামাখা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি

তাতে মনে হয়, যদি কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমাদের পথের কাঁটা বহুলাংশে দূর হতে পারে।

১. এ ব্যাপারে প্রথম জিনিসটি- যে সম্পর্কে আমি আজও এবং আগেও অনেক চিন্তা করেছি এবং যেটা অত্যন্ত জটিল মনে হয় ও গভীর মনোসংযোগ সাপেক্ষ। অর্থাৎ আমি সত্যকে জামায়াতের বাইরের লোকদের নিকট তুলে ধরার সমস্যাটার কথা বলছি। অন্যান্য দল সত্যকে পরিষ্কারভাবে জেনে নিক, এছাড়া তাদের কাছে আমরা আর কিছুই চাই না। স্মরণ রাখুন, একাজ নিছক মুখের কথায় সম্পন্ন হবে না। এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করতে হবে। বক্তৃতার খৈ ফুটিয়ে আর প্রেসের মাধ্যমে আদর্শ প্রচারের পরিবর্তে আমাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দিতে হবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আমরা পূর্ণ আন্তরিকতাসম্পন্ন এবং বিশেষ করে আমরা মুসলমানদের এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির সত্যিকার উপকার করতে চাই। কারোর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই। বরং দুনিয়ার সকল অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার সহানুভূতি রয়েছে।

পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে যদি আমরা নিজেদের কার্যাবলীর দ্বারা একথা প্রমাণ করে দেই যে, আমাদের জীবন কোনো বিশেষ দল, গোত্র অথবা জাতির জন্য নয় বরং হকের আদর্শের জন্য উৎসর্গিত, তাহলে মানুষের মন জয় করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না। আসলে এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অসংখ্য বিদ্বেষ বাসা বেঁধে আছে এবং তাদের বেশ পুরু একটা আস্তরণ আমাদের দেহের চতুর্দিকে লেপটে আছে। এ কারণে আমরা নিজেরাই আমাদের দাওয়াতের পথে প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছি। এ আস্তরণটি আমাদের যতদূর সম্ভব সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত যাতে করে মানুষ সত্য ও আসল জিনিসটিকে সহজে চিনতে পারে।

যদি আমরা নিজেদের স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, দল ও জাতীয়তা উদ্ভূত বিদ্বেষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি, তাহলে দুনিয়ার কটূক্তি কোনদিন বন্ধ না হলেও আমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করা থেকে দুনিয়াকে বিরত রাখার এই একটি মাত্র পথ আছে। বিদ্বেষের গন্ধও যদি থেকে যায় এবং সত্য ছাড়া নিজের সত্তার অথবা কোনো জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কোনো আকাংখাও যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য আবরণ সৃষ্টি করবো এবং পাহাড়ের মতো উঁচু করে নিজেদের দাওয়াতের পথ রোধ করে দাঁড়াবো। ঘরে-বাইরে, বাজারে, সভা-সমিতিতে, খানকাহ ও মসজিদে সর্বত্র সব দিক দিয়ে নিজেকে তুচ্ছ স্বার্থের অনেক উর্ধে অবস্থানকারী হিসেবে চিত্রিত করা অপরিহার্য।

আমার একথার গুরুত্ব বুঝবার জন্য আপনারা নবীগণের জীবনী অধ্যয়ন করুন। আল্লাহর তরফ থেকে যেসব আহ্বায়ক আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য আসেন, তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই সত্যের সম্পর্ক ছাড়া বাদ বাকি সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন। জাহিলী মর্যাদাবোধের সমস্ত বাঁধন কেটে ফেলেন। বিদ্বেষের মোটা মোটা শিকল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেন। এরই ফলে তাঁদের দাওয়াত জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সত্যানুসন্ধিৎসু দিলকে আঘাত করেছিল এবং যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের বুকের মধ্যে দল ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের পরিবর্তে মানবতার খেদমতের প্রেরণা জাগরূক ছিল। ঐ সকল হিদায়াতের আহবায়কদের আদর্শের অনুসারী হলে দীন প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আজই হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে জামায়াতের সাহিত্যে যদিও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু কাজের কোনো বিস্তারিত প্রোগ্রাম এখনো আমরা দিতে পারিনি। এখানে আমি এর চাইতে বেশী কিছু বলতে পারবো না যে, নিজের প্রাইভেট ও পাবলিক জীবনে একথা প্রমাণ করার চিন্তা করুন যে, আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টা হলো একমাত্র আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার। হানাফী-ওহাবী বিবাদ এবং দল-গোত্রের কু-ধারণা খতম করার এটিই একমাত্র পথ। আমাদের কোনো নতুন দল গঠন করতে হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া।

২. দ্বিতীয় যে জিনিসটার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এই যে, কোনো সত্যকে লাভ করা অথবা ইলম হাসিল করার পর মানুষের মধ্যে যে বড়াই ও অহংকার সৃষ্টি হয় সত্যের আহবায়কের জন্য তা প্রধানতম অন্তরায় স্বরূপ। তিনি মনে করতে থাকেন, আমি অন্যদের চাইতে অনেকটা উপরে উঠে গেছি। ফল এই দাঁড়ায় যে, নিজের দাওয়াতের পথে তিনি নিজেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান।

অনেক লোক এ অহংকারকে বেশ পারদর্শিতার সাথে প্রচ্ছন্ন করে রাখেন। কিন্তু তাদের দিলে এ ফিতনা পুরোপুরি সক্রিয় থাকে। এর প্রভাবে তাদের কথাবার্তা ও লেখার মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয়। সত্যের দাওয়াতের সঙ্গে কৃত্রিমতার সামান্যতম সম্পর্কও নেই। বড়াই ও অহংকারের প্রকাশ মানুষের মনে বিরক্ত উৎপাদন করে এবং তারা তখন নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়ে ফেলে। এ ব্যাধির ঔষুধ হলো এই যে, আপনার নিকট সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে, একে আপনার উপর আল্লাহর মেহেরবানী মনে করুন এবং এজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। এ অনুভূতি আপনার মধ্যে অহংকারের স্থলে নম্রতার ভাব সৃষ্টি করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।

যেখানে আল্লাহর দানের অনুভূতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, সেখানে আপনা-আপনি অহংকারের স্থলে নম্রতা ও প্রীতির ভাব সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে। জনগণের জন্য সত্যের আহ্বায়কদের দিলে ঠিক তেমনি গভীর ও আন্তরিক ভালবাসা থাকা উচিত যেমন একটি শিশুর জন্য মাতা-পিতার দিলে থাকে। মানুষের ভুলকে উপভোগ করার পরিবর্তে সে যেন তাতে মর্মাহত হয়। ভুল-ক্রটি বিচার করার পরিবর্তে তার মধ্যে যেন একটি সহানুভূতির সঞ্চার হয়। গর্ব ও অহংকারের পরিবর্তে তার মধ্যে যেন সহানুভূতিশীল অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা সৃষ্টি হলে তার কথাবার্তা ও ব্যবহারের ধরনের মধ্যেও উত্তাপের সৃষ্টি হয়, যার ফলে পাথরের মতো শক্ত দিলও নরম হয়ে যায়।

৩. রিপোর্টগুলো শুনে আমি অনুভব করছি, আমাদের রফিকগণ বিরোধী দলগুলোকে ঠিক সেইসব শব্দের সাহায্যে আঘাত করেন যাতে দীর্ঘকাল থেকে আমরা অভ্যস্ত। আমাদের বিরোধীদের উল্লেখ করে আমরা ঠিক সেইভাবে আত্মসুখ অনুভব করি যেভাবে অন্যান্য দল প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপমান থেকে আত্মসুখ অনুভব করে। এমন অনেক লোক আমাদের মধ্যে আছে যারা প্রকাশ্যে সতর্ক হলেও নির্জনে অন্যের বিরুদ্ধে খানিকটা ব্যাঙ্গোক্তি করে আনন্দ লাভ করে। এ ধরনের রিয়াকারী প্রদর্শনেচ্ছার মাধ্যমে আন্তরিকতা নামক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ জিনিসটার লালন কখনো সংগত হতে পারে না এবং আন্তরিকতা ছাড়া সত্যের দাওয়াত অন্যের মন-মগজে প্রবেশ করানো অসম্ভব।

আসলে যখন আমরা চিন্তা করি, আমরা যা কিছু জেনে নিয়েছি তা অন্যেরা জানে না এবং তারপর ধারণা করি, এমন সোজা ও স্পষ্ট কথা সবাই বুঝে না কেন, তখন আমাদের মধ্যে কিছুটা নেতৃসুলভ এবং কিছুটা শিক্ষকসুলভ ভাবের সৃষ্টি হয় এবং আমরা অন্যকে ঠিক সেইভাবে নিন্দাবাদ ও শাস্তি লাভের অধিকারী বলে মনে করি যেমন কোনো শিক্ষক নিজের ছাত্রের প্রত্যেক ভুলের দরুন তাকে কানমলা খাবার অধিকারী মনে করে থাকেন।

কিন্তু শিক্ষা সম্পর্ক যারা চিন্তা করেন, তারা জানেন যে, শিক্ষা দিবার এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। শিক্ষাকে যদি মনের গভীরে প্রবেশ করাবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে ক্রোধ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কঠোর ও রূঢ় ভাষা ব্যবহারের অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করুন। আপনি কারোর সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছেন না, শিক্ষা প্রচার ও অভিযান পরিচালনা করছেন এবং এ অভিযানে উত্তপ্ত হৃদয়, সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের অস্ত্রই কার্যকরী হতে পারে। নবী করীমের স. নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন্ দিনটি আপনার জীবনের কঠিনতম দিন ছিল? জবাবে বললেন, তায়েফের দিন। ঐ দিন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রস্তরাঘাত সহ্য করতে করতে একটি বাগানের

প্রাচীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বলা হয়, ঐ জালেমদের জন্য বদদোয়া করুন। কিন্তু তিনি বদদোয়া করার পরিবর্তে তায়েফবাসীদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করেন।

এই প্রাণাবেগ সৃষ্টি না করলে সম্ভবত দুনিয়ার আর সব কাজ হতে পারে কিন্তু হকের কাজ হতে পারে না। মানুষ যদি হকের আনন্দ সম্পর্কে অবহিত না থাকে, সততার সুগন্ধ থেকে বঞ্চিত থাকে, তাহলে তার ক্রোধ নয়, সহানুভূতি লাভ করা দরকার।

সর্বস্বীকৃত মৌলিক নীতিগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের সমস্ত দল একমত এবং যদি নম্রতা, ধৈর্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ-সিঞ্চিত ভালবাসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহলে সহজে ঐ সব দলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। মনে রাখা উচিত, একাজ বিতর্কালাপ ও বুদ্ধিগত বিজয় লাভের খায়েশ নিয়ে চলতে পারে না। এ খায়েশ মানুষকে কঠোরতা ও বিদ্বেষের পথে পরিচালিত করে।

আপনারা নিজেদের কথাবার্তা ও বক্তৃতার মধ্যে যখনই খায়েশের প্রভাব অনুভব করেন, তখনই নিজের নফসের লাগাম টেনে ধরুন এবং যার সঙ্গে আলোচনা করছেন তার মধ্যে যদি এর প্রকাশ দেখেন, তাহলে قَالُوْا سَلاَمًا এর পথ গ্রহণ করুন। আলোচনার সময় হার-জিতের প্রশ্নই কখনো ওঠা উচিত নয়।

আহবায়কের স্থান এ সব জিনিস থেকে অনেক উপরে। তাকে তো শুধু হকের কালেমার কতিপয় বীজ মনের মধ্যে বপন করতে হবে, অতঃপর চিন্তার চাষের দেখাশুনা করতে হবে।

কখনো এ ধারণা মনের মধ্যে আসতে দেবেন না যে, আমাদের কথাটিই স্বীকৃত হতে হবে। এ ধারণাই পারিভাষিক বিতর্কের প্রাণবস্তু। এরি মশ্‌ক্ (Practice) করে আসছি আমরা বছরের পর বছর ধরে। এখন সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাদের এ অভ্যাসের শিকড় কাটতে হবে।

এখন আমাদের বিতর্কালাপে জয়লাভ করার নয়, হেরে যাবার এবং বারবার হেরে যাবার অভ্যাস করতে হবে। যেখানে আলোচনার মধ্যে আন্তরিকতার প্রভাব খতম হতে শুরু করে, সেখানে মুখে তালা লাগিয়ে নিন এবং এর উপর অন্য পক্ষ খুশিতে হাততালি দেবে- এর পরোয়া করবেন না।

কথার প্রত্যেকটি ভুলের জন্য নিঃসংশয়ে মাফ চেয়ে নিন এবং আপনার উপর বিদ্রুপবাণ নিক্ষিপ্ত হবে- এর পরোয়া করবেন না। এ পরাজয়গুলোকে বরদাশত করার হিম্মত যদি থাকে, তাহলে এগিয়ে আসুন এবং কাজ করুন। অন্যথায় যদি

বিতর্কালাপের অস্ত্রের সাহায্যে কাউকে আপনি টেনে এনেও থাকেন, তাহলে যে পথ দিয়ে সে এসেছে আবার সে পথ দিয়েই একদিন ফিরে যাবে।

নবীগণের (আ.) কাজের বিশেষত্ব

এ ব্যাপারে নবীগণের আ. কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে আপনি জানতে পারবেন যে, এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভালভাবে বুঝে নেবার প্রয়োজন। বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দলের মধ্যে আমাদের দল নবীদের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। কাজেই আমাদের সরাসরি সেখান থেকেই রোশনি হাসিল করতে হবে।

আপনারা জানেন, কোনো নবী কখনো তাঁর জাতিকে এভাবে সম্বোধন করেননি যে, 'হে কাফেররা, ঈমান আনো!' অথবা 'হে পথ-ভ্রষ্টরা, সোজা পথে এসো।' বরং ভালবাসা মিশ্রিত ভঙ্গিতে يَا قَوْمُ (হে জাতি) يَاَيُّهَا النَّاسُ (হে মানবজাতি) এবং يَاَ اَهْلَ الْكِتَابِ (হে আসমানী কিতাব ধারণকারিগণ) বলে সম্বোধন করেছেন। আবার যে সব লোক তাঁদের সহযোগী হয়, তারা যখন ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তাদের এভাবে সম্বোধন করেননি যে, হে মোনাফিকরা! অথবা হে শপথ ভঙ্গকারীরা! নিজেদের কার্যধারা পরিবর্তন কর। বরং يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে আহ্বান জানান। অতঃপর যেসব লোক ঐ হকের আহ্বায়কদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন, তারাও নিজেদের দাওয়াতের ধারাকে ধৈর্য, ভালোবাসা ও নম্রতার সীমা অতিক্রম করতে দেননি।

আবার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এমন এক পর্যায় আসে, যখন একটি সৎ ও সংস্কারকারী দল নিজের কথা ও কাজের সাহায্যে হককে একেবারে উলঙ্গ করে দেয় এবং হকের চেহারা ধুলো-বালিমুক্ত পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে হককে প্রকাশ্যে দেখার পরও যে ব্যক্তি অহংকার, হঠকারিতা অথবা বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং যুক্তির বাণ খতম হয়ে যাবার পরও অস্বীকারের ভাব অব্যাহত রাখে, তাদের প্রতি নবীর সম্বোধনের ধারা বদলে যায়। তখন তিনি বিদ্রোহীদেরকে পরিষ্কার ভাষায় يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (হে কাফিররা) বলে সম্বোধন করেন। তখন তিনি নিজের জাতি থেকে পৃথক হয়ে যান। কিন্তু এর আগে দীর্ঘকাল ধরে তিনি নম্রতার সঙ্গেই দাওয়াত দিতে থাকেন।

নবী করীম স. নিজের জাতির সঙ্গে এ পদ্ধতি তখন এখতিয়ার করেন, যখন দাওয়াত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং জাতি অন্ধ বিরোধিতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর কথা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছিল এবং নবী করীম স.-কে হত্যা করার ইরাদা করেছিল। বিরুদ্ধপক্ষরা বলে থাকেন আসলে যতদিন মুহাম্মদ স. এবং তাঁর দল দুর্বল ছিল, ততদিন ধৈর্য ও ক্ষমা ছিল। কিন্তু যখন শক্তি সঞ্চার হতে লাগলো, তখন কঠোরতার পথ অবলম্বিত হলো। কিন্তু একথা সত্য নয়। আসল ব্যাপার হলো এই যে, নবী মানুষের দুর্বলতায় স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেন। তাঁর এ স্নেহধারা এত বিপুলহারে বর্ষিত হতে থাকে যে, লোকেরা এর মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে স্বার্থোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। নবী এসব কিছু লক্ষ্য করেন কিন্তু কাউকে পেছনে নিক্ষেপ করেন না। তিনি শুধু সাধারণভাবে দল ও দলের বাইরের লোকদের সমালোচনা করেন। مَا بَالُ قَوْمٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا (লোকদের কী হয়ে গেলো যে, তারা এরকম কথাবার্তা বলছে এবং আল্লাহর ভয় করে না।) যেসব লোক দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান না থাকার দরুন ভুল করে বসে এসব সতর্কবাণীর ফলে তারা ষোলআনা হঠকারী হবার কারণে জামায়াতের শৃংখলাকে ওলট-পালট করার তালে থাকে। তাদের দিক থেকে সংশোধনের সব রকম আশা যখন খতম হয়ে যায়, তখন নবী আবার তাঁর মেহনতের মূল্যবান ফল অর্থাৎ নিজের সালেহ (সৎ) জামায়াতকে বিপদমুক্ত করার জন্য وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এর পথে নিযুক্ত হন। আজ আমরা যে যুগে অবস্থান করছি এটি ফিতনা-বিপর্যয়ের যুগ। জ্ঞান ও শিক্ষার যেসব আলোকচ্ছটার উপর এ যুগ গর্ব করে, তা শুধু দুনিয়াকে অন্ধকার করার জন্য নিয়োজিত হতে পারে। বরং সত্যি বলতে কি বাতিলকে হক এবং হককে বাতিল হিসাবে চিত্রিত করা প্রচেষ্টার দিক দিয়ে ইতিহাসের কোনো যুগ এ যুগের মোকাবিলা করতে পারে না। আবার যখন হক সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত নয়, তখন অন্যের বিরুদ্ধে কঠোর পন্থা অবলম্বন করার অবকাশই বা কোথায়? এটা وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এর উপর আমল করার সময় নয়। এখন তো আমাদেরকে স্নেহ-ভালোবাসার একটি দীর্ঘযুগ অতিক্রম করতে হবে এবং এ যুগে কাউকে পেছনের দিকে নিক্ষেপও করা যাবে না।

অবশ্যই আল্লাহ যদি আমাদের সীমিত প্রচেষ্টা কবুল করে আমাদেরকে হককে প্রতিষ্ঠিত এবং বাতিল খতম করার জন্য কোনো সংগঠন কায়েম করার সুযোগ

দেন এবং قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [১] এর সুপ্রভাতের উদয় হয়, তাহলে এ আলোকচ্ছটা নিজেই খাঁটি ও ভেজাল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং মু'মিন ও মুনাফিককে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবে।

অতীতে আমাদের রফিকগণ যখনই নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধতি পরিহার করে সাত তাড়াতাড়ি কাজ করার চেষ্টা করেছে, তখনই এ ভুল ধারণা বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, আল্লাহ না-খাস্তা আমরা মুসলমানদেরকে মুসলমান মনে করি না। এ ভুল বুঝাবুঝিটা উপেক্ষণীয় নয়। এর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়াবে যে, লোকেরা আমাদের দাওয়াতের দিক থেকে কান বন্ধ করে নেবে।

আমাদের শুধু এতটুকুন বলার আছে যে, বর্তমানে মুসলমানদের বৃহত্তম শ্রেণীটি দীনের নির্ভুল জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে এবং বর্তমান শয়তানী ব্যবস্থা তাদের মূর্খতা বৃদ্ধি করার কাজে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে।

নিজেদের এবং বাইরের লোকেরা তাদেরকে এমন ইনজেকশান দিয়েছে যে, তাদের শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাদের ঘ্রাণশক্তিকে সক্রিয় করে তোলাই এখন আমাদের কর্তব্য। ঘ্রাণশক্তি সক্রিয় হয়ে গেলেই তারা নিজেরাই নিজেদের বর্তমান অবস্থার প্রতি বেজার হয়ে যাবে এবং কুফর, শিরক ও মোনাফিকীর যাবতীয় অপবিত্রতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে।

এ উদ্দেশ্যে আমাদের করণীয় হলো এই যে, আমাদেরকে কুফর ও শিরকের যাবতীয় কথা ও কাজের কুফরী ও শিরকীকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিতে হবে। ব্যস, এতটুকুনই যথেষ্ট। শিরককে অনুভব করার পর কোনো মুসলমানের আত্মা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না। যে ব্যক্তির মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার গুণ সৃষ্টি হয়, সে নিজেই নিজের শরীরের অপবিত্রতা ধুয়ে ফেলতে থাকে। এভাবে যদি আমরা মুসলমানদের মধ্যে দীনের সঠিক চেতনা সঞ্চার করতে পারি, তাহলে তারা নিজেরাই সমস্ত অপরিচ্ছন্নতামুক্ত হবার চেষ্টা করবে।

এই দীনী চেতনাকে সর্বসাধারণ্যে বিস্তার লাভ করাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো দীনের মূলনীতিগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা, খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নয়। দীনের বুনিয়াদ তাওহীদ, রিসালাত ও পরকালের নির্ভুল ধারণা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব ধারণা যদি মনের মধ্যে তার প্রয়োজনীয়তা

---

১. নির্ভুল কথাকে ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা থেকে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে (আল বাকারা ঃ ২৫৬)

বিস্তৃত চেহারাসহ প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে দীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে খুঁটিনাটি ব্যাপার আপনা-আপনি সংশোধিত হতে থাকবে এবং তাদের জন্য আমাদের কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়োজন হবে না। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন সুষ্ঠু রুচিবোধ জাগ্রত হয়, তখন তাকে তার বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের ছোটখাটো প্রত্যেকটি ময়লার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করার প্রয়োজন হয় না। বরং তার জীবনের প্রত্যেক বিভাগে আপনা-আপনি রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্নতা বিকাশ লাভ করতে থাকে।

এবার আমি আপনাদের প্রশ্নটির দিকে দৃষ্টি দেবো। আপনাদের প্রশ্ন ছিল, খুঁটিনাটি ব্যাপার বলতে কি আমি উচ্চস্বরে 'আমীন' পাঠ করা প্রভৃতি ব্যাপার বুঝি? না, এখানে খুঁটিনাটি বলতে আমি উচ্চস্বরে 'আমীন' পাঠ করা এবং 'রাফে ইয়াদায়েন' ধরনের ব্যাপার বুঝাচ্ছি না। এসব ইজতিহাদী মাসায়ালার ব্যাপারে তো আমাদেরকে হামেশা সহিষ্ণু হতে হবে। কারণ দীনের মধ্যে এদের উভয় দিকের অবকাশ আছে। আমি এখানে সেইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারকেও আত্মস্থ করার পরামর্শ দিচ্ছি যাদের জন্য দীনের মধ্যে কোনো অবকাশ নেই কিন্তু দীনের খেদমতের জন্য দাওয়াতের এ পর্যায়ে তাদেরকে এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন হয়।

যদি আমরা এ পদ্ধতি গ্রহণ না করি, তাহলে ফল এই দাঁড়াবে যে, শাখা-প্রশাখা কাটতে কাটতেই আমরা নিজেদের সমস্ত সময় নষ্ট করে দেবো এবং ফিতনার মূলের দিকে দৃষ্টি দেবার সময়ই পাবো না। আমাদের কাজ একমাত্র তখনই সঠিকভাবে হতে পারে, যখন আমরা তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান পূর্ণরূপে জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর খুঁটিনাটি ব্যাপারে মানুষ সত্যকে পেতে পারে। ধীরে ধীরে তারা অনুভব করতে থাকবে যে, অমুক কাজটা আমরা করে থাকি কিন্তু সেটি আমাদের তাওহীদ বিশ্বাসের সঙ্গে একত্র হতে পারে না। অমুক রেওয়াজটা প্রচলিত আছে কিন্তু তা আমাদের রিসালাতের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। অমুক অভ্যাসটা প্রসার লাভ করেছে কিন্তু তা আমাদের পরকালের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়।

সার কথা হলো এই যে, এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোনো দলকে কঠোরভাবে আক্রমণ করা অথবা কারোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আমাদের কাজের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। সম্ভাব্য সকল উপায়ে এসব ব্যাপার এড়িয়ে যান। যদি কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এ ব্যাপারে কিছু শুনা পছন্দ করেন, তাহলে নম্রতার সঙ্গে তাকে বলুন, ভাই সাহেব, আপনারা এ কেমন কাজটি করে বেড়াচ্ছেন! অতঃপর তার উপর যদি এর কোনো প্রভাব পড়ে, তাহলে ভালো, অন্যথায় খামোশ হয়ে

যান। যেসব জিনিসের মাধ্যমে আসল দীনের উপর আঘাত পড়ে, সেগুলোর সংস্কারের প্রচেষ্টা চালানো উচিত পূর্ণোদ্যমে।

সংস্কারের কাজে প্রথম কোনো আসলের সর্বাধিক নিকটবর্তী দাবী থেকে শুরু করা উচিত, তারপর তা থেকে সামান্য দূরবর্তী, তারপর তা থেকে অধিকতর দূরবর্তী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাওহীদ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলো থেকেই প্রথমে সেই সব জিনিস নেয়া উচিত যেগুলোর উপর সাধারণত সব মুসলমান একমত। অতঃপর সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করুন যেগুলো তাওহীদের প্রধানতম বিষয়াবলী থেকে উদ্ভূত। অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন এবং তাওহীদের সেই শেষ দাবীগুলোর দিকে পথ নির্দেশ করুন, যেগুলো থেকে জনগণের দৃষ্টি পুরোপুরি অপসারিত হয়েছে এবং আলেম সমাজও যেগুলোর সক্রিয় দাবী থেকে অনেকটা গাফেল হয়ে পড়েছেন। আশা করি, আমাদের রফিকগণ এ পরামর্শগুলোকে কার্যকরী করার চেষ্টা করবেন।

শেষ অধিবেশন

২৭ মার্চ (মাগরিব ও ইশা'র নামাযের মাঝামাঝি সময়)

প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ অধিবেশনটি আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে হিদায়াত দেবার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। এতে আমীরে জামায়াত যে ভাষণ দেন তা নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

আমীরে জামায়াতের শেষ বক্তৃতা

সকালের অধিবেশনে বিভিন্ন জামায়াতের পক্ষ থেকে যে সব কার্যবিবরণী পেশ করা হয় আমার সম্মানিত সহযোগী মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তার উপর মন্তব্য করেছেন। এরপর আর আমি অতিরিক্ত মন্তব্যের প্রয়োজন অনুভব করি না। আমি শুধু কতিপয় ব্যাপারে পরামর্শ দিতে চাই।

আমাদের প্রচার নীতি

গুরুত্ব অনুযায়ী জোর দেয়া

প্রচার নীতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম জেনে রাখুন, اَلْاَقْدَمُ فَالْاَقْدَمُ আমাদের দাওয়াতের নীতি হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে জিনিসটা যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ তার উপর ঠিক তত বেশী গুরুত্ব এবং ততটা জোর দেয়া উচিত। অনুরূপ যে জিনিসটার দীনী গুরুত্ব কম তার উপর তদনুরূপ দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং তার মূল্য ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কখনো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

খুঁটিনাটি ব্যাপারের পূর্বে আসল জিনিসটির উপর জোর দেয়া

দ্বিতীয় কথা মনে রাখা উচিত যে, খুঁটিনাটি ব্যাপারের মধ্যে প্রতেকটির উপর আলাদা আলাদা করে জোর দেয়ার পরিবর্তে সেই আসল ব্যাপার সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যার সংশোধনের পর খুঁটিনাটি ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে আপনা-আপনিই সংশোধিত হয়ে যায়। ধরুন, কোনো গৃহে আগুন লেগেছে। তার বিভিন্ন স্থান থেকে কড়িকাঠ ও ছোট ছোট কাঠ জ্বলে জ্বলে পড়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে এক একটি কড়িকাঠকে বাঁচাবার তদবির করা যাবে না। বরং সরাসরি এমন একটি

উপায় গ্রহণ করতে হবে যার সাহায্যে সমস্ত আগুনটা নিভিয়ে দেবার চেষ্টা চালানো সম্ভব হয়।

অথবা ধরুন, একজন লোকের শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে গেছে এবং শরীরের স্থানে স্থানে ফোঁড়া দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে একটি ফোঁড়া কেটে ফেলার এবং অন্যটা গেলে দেবার পরিবর্তে সমগ্র শরীরের রক্ত পরিশুদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমাদের প্রচারকদের স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে জেনে নেয়া উচিত যে, মানুষের আংশিক বিপথগামিতার আসল কারণ কি? অতঃপর প্রত্যেকটি আঘাত ঐ আসল কারণটি দূর করার জন্য করা উচিত।

একাজের মধ্যে গলদের বিপুল সংখ্যক শাখা-প্রশাখা দেখে ঘাবড়ানো উচিত নয়। অনুরূপভাবে সৎগুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে হবে। সেগুলোর মূলকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং এর পরই তার গোড়ায় পানি ঢালার জন্যে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতে হবে। এই মূল যদি একবার গেড়ে বসতে পারে, তাহলে ফল-মূল আপনিই বের হতে থাকবে।

এ নীতির ভিত্তিতেই জামায়াতের সমগ্র সাহিত্য রচিত হয়েছে। আপনারা জানেন, এর মধ্যে মৌলিক বিষয়াবলীকে শক্তিশালী করার জন্য জোরদার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে সাধারণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শাখা-প্রশাখা কাট-ছাঁট করার পরিবর্তে মূল ও শিকড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে।

আপনারা মুসলমানদের জীবন প্রাসাদের লুপ্তপ্রায় সৌন্দর্য রেখাগুলোর দিকে বেশী দৃষ্টি দেবেন না বরং তার ভিতরটার কথা চিন্তা করুন। নয়তো দেয়ালের সৌন্দর্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে কিন্তু এর পূর্ণতার পূর্বেই সমগ্র ইমারতটিকে ধসে পড়তে দেখার জন্য আপনাদেরকে বাধ্য হতে হবে।

আমাদের মুখে যখনই সংস্কারের নাম শুনা গেছে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটে গেছে ছোট ছোট গলদ ও দুষ্কর্মের দিকে এবং এরপর সংশোধনের প্রত্যেকটি অভিযান চালানো হয়েছে ঐ পুরানো রীতি অনুযায়ী। আপনারা এখন এ রীতিকে পুরোপুরি বদলিয়ে দিন। বহুবারের অভিজ্ঞতায় জানা গেছে যে, খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর হামলা চালিয়ে আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো না। এপথটা চলে গেছে বিতর্কের প্রাচীর ঘেঁষে এবং এভাবে কাজ করলে খামাখা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। রকমারি গায় কাঁটা বিদ্ধকারী উপাধি যেমন 'ওহাবী', 'বিদআতী' প্রভৃতি মুখে এসে যায়। এমন কি ব্যাপার গড়ায় মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত। এ প্রচার পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি থেকে পূর্ণরূপে বিরত থাকুন।

কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞান

ইতিপূর্বে মওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর বক্তৃতায় একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। চিন্তা করলে আপনারা জানতে পারেন যে, আসলে সমস্ত গলদ সৃষ্টি হয়েছে তাওহীদকে না বুঝার দরুন অথবা রিসালাতের তাৎপর্য না জানার এবং পরকাল বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। এ ছাড়াও কতকগুলো গলদ এমন আছে যা দীনের আসল ও খুঁটিনাটি বিষয়ের নির্ভুল বিন্যাসকে ওলট-পালট করে দেবার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বিকৃতির এ কারণগুলোর একটি কারণ আছে এবং তা হলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সম্পর্ক বিচ্যুতি। শুধু জাহেলদের মধ্যেই যে এগুলো পাওয়া যায় তা নয়, বরং অনেক আলেমও কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যক্ষ ও গভীর জ্ঞান রাখেন না।

এখন এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদের সংশোধন কাজ করতে হবে মূল থেকে শুরু করে উপরের দিকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মৌলিক বিশ্বাসগুলোর সংশোধন হবে না, ততক্ষণ খুঁটিনাটি ব্যাপারে মানুষের বিপথগামিতাকে ধৈর্য সহকারে বরদাশত করতে হবে। আমার বক্তব্য এ নয় যে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে মানুষকে আজাদ ছেড়ে দেয়া হয়েছে বরং আমি বলতে চাই যে, প্রথম পদক্ষেপে খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর কখনো বেশী জোর দেয়া উচিত নয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, দুষ্টবুদ্ধি ও শয়তানী প্রবৃত্তির দরুণ খুব কম লোকই এসব গোমরাহীর প্রতি সমর্থন জানাবে। জনসাধারণ নিছক অজ্ঞতার কারণে বিপথগামী হয়েছে। দীর্ঘকালের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার কারণে তাদের দিলে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, তারা যে সব পদ্ধতি ইখতিয়ার করেছে তারই নাম দীন। এদের সংশোধন করতে গেলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাওহীদ, নবুওয়াত ও পরকাল সম্পর্কিত ইসলামী ধারণা এদের দিলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শুধু এভাবেই এদের সংশোধন হতে পারে। এদের আকীদা-বিশ্বাসগুলোর সংশোধনে যদি আমরা কামিয়াব হতে পারি, তাহলে কোনো বিরুদ্ধবাদী 'ওহাবী' 'ওহাবী' চিৎকার করে ভিড় জমাতে পারবে না। বরং সে নিজেই ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

আরবের বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তা করলেও এর সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। নবী করীমের স. দাওয়াত উপেক্ষাকারীদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রতম দলই ব্যক্তিস্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরোধিতা করছিল। নয়তো বাকি সবাই প্রতারিত হচ্ছিল এবং মোহের পেছনে ছুটে চলছিল। অতঃপর যখন আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হলো এবং উন্মুক্ত হয়ে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো, তখন নিঃস্বার্থ হক-পরস্ত লোকদের জন্য অস্বীকার করার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। দেশের সাধারণ জনগণ সত্যের সম্মুখে অস্ত্র

সংবরণ করলো এবং অবশেষে ফল এই দাঁড়ালো যে, যেসব লোক স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে লড়াই করছিল, তারা দেখলো, ময়দানে তারা একাকীই রয়ে গেছে কাজেই তারা বাধ্য হলো মাথা নত করতে।

আজও হকের দাওয়াত এ পথেই কামিয়াব হতে পারে। সত্যকে যদি মানুষের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে তাদের মধ্যে যাদের উদ্দেশ্য সৎ, তাদের প্রতারণার তেলেসমাতি খতম হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের নেতৃবৃন্দকে পরিত্যাগ করে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর যেসব লোক স্বার্থের খাতিরে পথ রোধ করে বসেছে তারাও এতটা অসহায় হয়ে যাবে যে, আমাদের চলমান গাড়ীকে তারা থামাতে চাইলেও থামাতে পারবে না।

যদি এ কার্যসূচি গ্রহণ করতে চান, তাহলে 'জোরে আমীন পড়া', 'রাফে ইয়াদায়েন' এবং 'কুল'- এর ঝগড়া খতম করুন। চিন্তা করুন, আল্লাহর রাসূল কি এই ধরনের ত্রুটি সংশোধন করতে এসেছিলেন? ইসলামের আদর্শ ও লক্ষ্য কি শুধু এতটুকুনই। কুরআনের শিক্ষা কি মানুষের নিকট শুধু এটুকু জিনিসেরই দাবী করে? যদি এ না হয়, তাহলে আপনাদের পূর্ণ দৃষ্টি সেই সব বিষয়ের দিকে নিবদ্ধ হয় না কেন- যার জন্য আল্লাহর নবীগণ প্রতিযুগে বিরুদ্ধবাদীদের জুলুম বরদাশত করেছিলেন?

এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর গুরুত্ব অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, অথচ দীন প্রতিষ্ঠার কাজে এগুলোর কোনই গুরুত্ব নেই। মানুষ কেমন করে আল্লাহর দীনকে সাগ্রহে ও সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করে নিতে পারে এবং নবী করীমের সুন্নাতের আনুগত্য করতে পারে সেই চিন্তা করুন। এ জিনিসটা যদি পয়দা হয়ে যায়, তাহলে প্রত্যক্ষ উক্তি যা কিছু কিতাব ও সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দেখবে, তাকে গ্রহণ করবে এবং যার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যাবে না, তাকে পরিত্যাগ করবে। এই একটি মৌলিক সংশোধনের উপরই জোর দেওয়া উচিত। মূল থেকে শাখা-প্রশাখার দিকে নিয়ে যাবার যে পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টান্ত নবী করীমের স. চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাকে উপেক্ষা করে নিছক হাদীসের কিতাবগুলোর আনুগত্য শুরু করে দিলে তা হবে হাদীসের কিতাবের আনুগত্য, নবী চরিত্রের আনুগত্য নয়।

আজ আমাদের যুগে যত গলদ ও দুষ্কৃতি দেখা যাচ্ছে ইসলামপূর্ব যুগের আরবে এগুলো এর চাইতে কম ছিল না। তাহলে তখন কি একই মুহূর্তে সবগুলোর উপর আঘাত হানা হয়েছিল? একই লাফে কি সংশোধনের সিঁড়ি পার হয়ে যাওয়া হয়েছিল? না, বরং সংশোধনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তারপর বুনিয়াদী নৈতিক বৃত্তির শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। অতঃপর জীবনক্ষেত্রের এক একটি কালো দাগ ধুয়ে ফেলার সিলসিলা কয়েক বছর জারি ছিল। আপনারা যদি নবী করীমের

স. আনুগত্য করতে চান, তাহলে প্রথমে নবীর কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করুন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকুন।

বাড়িয়ে চাড়িয়ে পেশ করা থেকে বিরত থাকুন

আমি আরেকটা জিনিস অনুভব করেছি। আমাদের রফিকদের মধ্যে কাজকে বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলার প্রবণতা কখনো কখনো সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। আমি চাই এই প্রবণতাটাকে খতম করে দিতে। শুধু নিজের কার্যাবলীই বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলা নয়, স্বস্থানে নিজের কাজকেও সন্তোষজনক মনে করা উচিত নয়। উন্নত থেকে উন্নততর পদ্ধতিতে কাজ করার পরও নিশ্চিত হয়ে যাবেন না। এর ভালো দিকগুলোর উপর সন্তুষ্ট হবার পরিবর্তে দুর্বল দিকগুলো দেখে মনে অস্থিরতা অনুভব করুন। যে কাজটা নির্ভুল হয়েছে তার জন্য আল্লাহর নিকট শোকরগুজারী করুন এবং যে কমতি থেকে গেছে, তা পূর্ণ করার সুযোগ ও ক্ষমতাও তাঁর নিকট চান। আবার আমার এও সন্দেহ হচ্ছে যে, অন্যান্য দলের লোকদের উপর কাজ করার সময় আপনারা বিতর্কে প্রবৃত্ত হন এবং গর্ব ও বড়াই করতে থাকেন। এটা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে খুব ভাল কথা। আসলে এ সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহলে এ মুসীবত থেকে নাজাত হাসিল করুন।

এ প্রসঙ্গে নিজের কর্মপদ্ধতি ও কথা বলার ভঙ্গির মাধ্যমে অন্য দলের নিকট একথা পরিষ্কার করে দিন যে, আমরা কারোর সঙ্গে দলীয় সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে চাই না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো গলদ ও দুষ্কর্মের ভিত্তিগুলোকেই নির্মূল করা এবং আমরা সমগ্র মানব জাতিকেই সম্বোধন করি। যে কেউ সত্যকে উপেক্ষা করবে আমরা অবশ্য তার ক্রটি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবো। এরপর তার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ করে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা নেই।

সার কথা হলো এই যে, কমপক্ষে আপনাদের কর্মপদ্ধতি দেখে কোনো দল যেন এ সন্দেহ করার সুযোগ না পায় যে, আপনারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা তো কেবল কুফরী ও জাহেলী ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের সঙ্গেই আমাদের মোকাবিলা এবং এদের সঙ্গে যার যত ডিগ্রী সম্পর্ক সেই হারেই তার সঙ্গে আমাদের শত্রুতাও কঠোরতা হবে।

সম্মিলিত সভা না করা

অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে যে সব সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোর সাথে শরীক হয়ে আমরা বক্তৃতা করতে পারি কি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এভাবে আমাদের চিন্তাধারা প্রচারের সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হলো এই যে, এ কর্মপদ্ধতি ফলপ্রসূ নয়। একই মঞ্চ থেকে যখন রকমারি বুলি আওড়ানো হয় এবং তারই ফাঁকে আমাদের দাওয়াত পৌছানো হয়, তখন লোক মনে করতে থাকে যে, আমাদেরকে খুশী করার জন্য যেসব কথা শুনানো হয় এও বোধ হয় তারই মধ্যে শামিল। অথবা এ সভাটি একটি মানসিক দস্তরখান। এর ওপর যেখানে রকমারি মোরব্বা ও আচার রাখা আছে, সেখানে এও বুঝি নতুন ধরনের কোনো একটি আচার। রং-বেরংগের প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার ঢঙে মনে করুন, আপনারা নিজেদের পয়গামটা ভালোভাবে পেশই করে দিলেন, তাহলেও ফল এর থেকে বেশি কিছু হবে না যে, লোক আমাদেরকে বাহবা দিয়ে বলবে অমুক জন কী চমৎকারই না বললেন!

আমাদের জাতির অবস্থা বর্তমানে ঠিক সেই বিকৃতমনা ধনীর মতো, যার আশে-পাশে অনেক পা-ধরা মোসাহেব থাকে এবং তারা তাকে খুশী করার কাজে হামেশা ব্যাপৃত থাকে। ঐসব মোসাহেবের দলে ভিড়ে আপনারা দীনের হিকমত এবং জীবনের তাৎপর্যকে যতই ধীরে-সুস্থে এং গভীরভাবে পেশ করেন না কেন, এই ধনী স্বভাব জাতি আপনাদের কথাগুলোকেও ঠিক সেই কানে শুনবে, যে কানে অন্যান্য মোসাহেবের কথা সে শুনে থাকে।

এ সব কারণে জামায়াতের বক্তাদের জন্য পরামর্শ হলো এই যে, প্রথমে নিজের পৃথক সত্তা অথবা অন্য কথায় বৈশিষ্ট্যকে ভালোভাবে শক্তিশালী করে নিন এবং একেবারে পৃথক পদ্ধতিতে নিজের আদর্শ পেশ করতে থাকুন। অবশ্য বাজারে যে উন্নত বক্তৃতার রেকর্ড অত্যন্ত জনপ্রিয় তার মধ্যে যদি নিজেদের সুর ভরতে পারেন, তাহলে তা ফলপ্রসূ হবে। বিভিন্ন নেতা ও বক্তৃতার উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করুন যাতে করে তাদের বক্তৃতার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনাদের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। যখন কিছুদিন পর্যন্ত তারা নিছক মুখে আমাদের আদর্শ বিবৃত করতে থাকবেন, তখন একদিন এমনও হতে পারে যে, তারা নিজেদের আওয়াজ ও জনমতের চাপে নিজেদের কাজের ধরনও বদলে দেবেন। এ পরিকল্পনাটাকে যদি ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত যেসব বক্তা অর্থের বিনিময়ে বক্তৃতা করে সমগ্র জাতির স্বভাব বিগড়ে দিয়েছে, তাদেরকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে এবং সাধারণ লোকেরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কাজের লোককে সামনে আনবে।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

একথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা নিজেদের মতাদর্শের প্রচারের জন্য স্থানে স্থানে মাদ্রাসা কায়েম করার চিন্তা করছেন। এমনকি অনেক স্থানে কার্যকরী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে অবশ্য এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করবেন যে, মাদ্রাসা পরিচালনা করা যেন একটি উদ্দেশ্যে পরিণত না হয়। শিক্ষাকে উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে আমাদের ব্যবহার করতে হবে। যেখানেই অনুভূত হবে যে, আপনাদের মাদ্রাসা উদ্দেশ্যের স্থান দখল করছে এবং উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেখানেই এই ধরনের মাদ্রাসা ভেঙ্গে মিসমার করে দিন এবং তার ধ্বংসাবশেষকে দলিত মথিত করে নিজের মনযিলের দিকে ধাবিত হোন। এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে গন্তব্যকে হামেশা দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে।

মিছাল স্বরূপ, আপনারা দেখছেন একটি জাতি কোটি কোটি টাকা খরচ করে যুদ্ধের প্রয়োজনে যে কারখানা তৈরি করে থাকে, তাকে যখন সে আসল উদ্দেশ্যের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখে, তখন নিজেই স্বহস্তে তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই যুদ্ধে রাশিয়া তার বেশুমার শিল্পকেন্দ্র এবং ফ্রান্স তার নৌবহর ধ্বংস করে দিয়েছে। আমার এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করার কারণ হলো এই যে, অতীতে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী আমাদের বহু বুযুর্গ এ ভুলটি করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা মাদ্রাসা পরিচালনাকে একটি মাধ্যমের পরিবর্তে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। আপনাদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

স্থানীয় কাজ ও সংগঠন

এখন স্থান, কাজ ও সংগঠনের প্রশ্নে আসুন। এ ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

আর্থিক কুরবানী

সবার আগে যে জিনিসটার দিকে নজর দেয়া উচিত তা হলো এই যে, নিজ নিজ হালকার রুকনদের মধ্যে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা জাগিয়ে তুলুন। এতদিন অন্যান্য বহু প্রেরণার তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশী প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু আর্থিক কুরবানীর প্রেরণার তুলনামূলক হার অনেক কম। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও যেন স্মরণ থাকে যে, এ প্ররণার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে নৈতিক দায়িত্বানুভূতির উপর। নিয়ম-কানুনের সাহায্যে যেন এ গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা না করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা করা উচিত, যখন তিনি মুসলমান হয়েছেন, তখন তার ধন-সম্পদ যদি মুসলমান না হয়, তাহলে ইসলামের দাবী পূর্ণ হয় না। নিজের সঙ্গে নিজের ধন-সম্পদকেও ইসলামের গণ্ডিতে আবদ্ধ করুন। নিজের দুর্বল ভাইকে সাহায্য করে এবং নিজের বাইতুলমালকে শক্তিশালী করে এটা সম্পাদন করা যেতে পারে। اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً এর উদ্দেশ্যও হলো তাই। আবার আল্লাহর পথে ব্যয়িত সম্পদের পরিমাণ দিয়ে কুরবানীর প্রেরণার পরিমাপ করা যায় না। বরং এর পরিমাপ করা যায় সেই সব কষ্টদায়ক অবস্থার সাহায্যে যার মোকাবিলা করতে করতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে অনেক সময় একটি পয়সা এক হাজার টাকা থেকে বেশী ভারী হয়। আল্লাহ দেখেন না কতটা ছিলো বরং দেখেন, কি বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক বৈঠকে শরিক হওয়া

দ্বিতীয় জিনিসটার আয়োজন অত্যন্ত কঠোরভাবে করতে হবে, তা হলো সাপ্তাহিক বৈঠক। বিভিন্নস্থানে জামায়াতী ব্যবস্থার অপমৃত্যুর কারণ ছিল এই যে, সেখানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে একত্র রাখার এবং জামায়াতের সঙ্গে তাদের সক্রিয় আগ্রহকে সঞ্জীবিত রাখার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি চাই ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে নরম না হতে।

প্রত্যেক জায়গার সমস্ত স্থানীয় রুকনকে সাপ্তাহিক বৈঠকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে যোগদান করা উচিত। যে রুকন কোনো কারণে শরিক না হতে পারেন, তাকে নিজের আমীরের সম্মুখে নিজের অনুপস্থিতির জন্য সংগত ওজর পেশ করতে

হবে। যদি কোন দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ ওজর পেশ করা হয়, তাহলে অবশেষে সত্য প্রকাশিত হবে।

উপরন্তু যে রুকন বিনা ওজরে অথবা তুচ্ছ ওজর দেখিয়ে পরপর চার সপ্তাহ সভায় যোগদান না করেন অথবা দীর্ঘকাল থেকে মাঝে মাঝে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতে শুরু করেন, তার সম্পর্কে জেনে নেয়া উচিত যে, তিনি জামায়াত ব্যবস্থার বিধিবিধান বরদাশত করার যোগ্যতা রাখেন না।

সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা ছাড়া যেখানে একই জেলায় অথবা নিকটের কয়েকটি জেলায় বিভিন্ন রুকন থাকেন, সেখানে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সময় ও স্থান নির্ধারণ করে প্রত্যেক দ্বিতীয়, তৃতীয় মাসে সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। দ্বারভাঙ্গা সম্মেলনে সাপ্তাহিক সভার জন্য আমি যে হিদায়াত দিয়েছিলাম, তার আলোকে এ সভার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে যে সব এলাকার বেশীর ভাগ রুকন বিভিন্ন গ্রামে বা শহরে একাকী পড়ে গেছেন, সেখানে এ ধরনের ত্রৈমাসিক বা দ্বিমাসিক সভা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এছাড়া বিক্ষিপ্ত রুকনগণ অবশেষে নষ্ট হয়ে যাবেন।

কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা

এছাড়াও কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে গাফলতি করবেন না। এ সম্পর্ক রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন একটি পদ্ধতি হলো, পত্র মারফত আমাকে স্থানীয় সকল রকমের পরিস্থিতি এবং কাজের গতি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকুন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার কোনো সেক্রেটারিয়েট নেই, কাজেই জবাবী পত্র খুব বেশী পাঠানো উচিত নয়। প্রত্যেক দ্বিতীয়, তৃতীয় মাসে কাজের রিপোর্ট কেন্দ্রে পৌঁছলেই হলো ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট। অর্থাৎ জামায়াত কি অবস্থায় আছে! কোথাও কাজে ভাটা পড়ার উপক্রম হয়নি তো! কোথাও কার্যব্যবস্থার যন্ত্রটির মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হলো না তো! কোথাও কোনো অভ্যন্তরীণ অথবা বাইরের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়নি তো! এহেন পরিস্থিতিতে অবস্থার সংশোধনের জন্য কেন্দ্র প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছাবে। কাইয়েমে (সেক্রেটারী জেনারেল) জামায়াতের দায়িত্ব পালন করার মতো যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি পেয়ে যাই, তাহলে তিনি সফর করে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কাজের দেখাশুনাও করতে থাকবেন। যতক্ষণ এ অবস্থার সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ আপনারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন এবং মাঝে মাঝে কেন্দ্রে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতে থাকুন। পরে যখন ট্রেনিং কেন্দ্র কায়েম হবে, তখন স্থানীয় জামায়াতের আমীরগণ এবং অন্যান্য সুবিবেচক রুকনগণ এখানে এসে অনেক বেশী উপকৃত হতে পারবেন।

বয়স্কদের শিক্ষা

কাপুরথলার জামায়াত বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কিত যে পরিকল্পনা কার্যকরী করেছে, সেটি অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়েছে। আমি চাই, একাজটা সব জায়গায় শুরু হয়ে যাক। এর ফলে একদিকে আল্লাহর পথে নিয়মিতভাবে সময় কুরবানী করার অভ্যাস হবে আর অন্যদিকে জনগণের সঙ্গে আপনাদের সরাসরি সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং আপনারা তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করার সুযোগ লাভ করবেন। উপরন্তু শিক্ষা বিস্তার করে নিজেদের সাহিত্যের প্রসার ও পয়গামের বিপুল প্রচারের জন্য ব্যাপকতর ক্ষেত্র তৈরি করে নেবেন। শুধু এই নয়, অবৈতনিক খেদমত থেকে যারাই উপকৃত হবে, তারাই আপনাদের ব্যবহার দেখে এতটা প্রভাবিত হবে যে, অতি সহজে আপনাদের কথা তাদের মনের গভীরতম প্রদেশে স্থান লাভ করবে।

একাজের গুরুত্ব কতটুকু তা আন্দাজ করতে হলে শুধু এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, আমাদের আন্দোলন প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো এদেশের জনগণের অশিক্ষা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সর্বসাধারণ্যে শিক্ষার প্রসার হবার কারণে সেখানকার অবস্থা হলো এই যে, একটি বই প্রেস থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ৫০ লক্ষ লোকের হাতে পৌঁছে যায়। এথেকে আন্দাজ করুন শিক্ষার কারণে চিন্তার প্রসার কত দ্রুততর হয়। বিপরীতপক্ষে আমাদের নিজেদের চিন্তাধারা সাধারণ্যে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে এবং বছরের পর বছর ধরে প্রচেষ্টা চালাবার পরও জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র-তম অংশকে নিজেদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত করা যায়। এ বাধা দূর করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একাজ করতে বলছি না। শুধু তারাই এ নাজুক কাজটির ভার গ্রহণ করুক, যারা বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রাখেন।

জামেয়া ইসলামিয়া এ ব্যাপারে যে বই-পত্র প্রকাশ করেছে, তা থেকে উপকৃত হোন এবং তার মধ্যে কোনো ক্ষতিকর জিনিস দেখলে তা থেকে গা বাঁচিয়ে কাজ করে যান। বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার পদ্ধতি তাদের বইপত্রের মাধ্যমে শিখাবার চেষ্টা করুন। অতঃপর যতই আপনারা কর্মক্ষেত্রে নামবেন, ততই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনাদের যোগ্যতার বিকাশ ঘটবে এবং এই সঙ্গে কাজের গতিও দ্রুততর হবে। আল্লাহ যেন আপনাদের এই সদুদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এ বক্তৃতার পর শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি সূচিত হলো।

সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তন

শেষ অধিবেশন খতম হবার পর বেশীর ভাগ লোক প্রথম গাড়ীতেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। শুধু তারাই রয়ে গেলেন যাদেরকে আমীরে জামায়াত নিজেই কোনো

জরুরী পরামর্শের জন্য ডেকেছিলেন অথবা যারা নিজেদের ব্যাপারে কোনো হিদায়াত গ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন।

সম্মেলনের খরচপত্র

খরচপত্রের ব্যাপারে আমাদের এখানে সাজসজ্জা ও বাড়াবাড়ির অপ্রয়োজনীয় খরচের অস্তিত্বই নেই। অবশ্য থাকা-খাওয়ার প্রশ্ন রয়েছে। তবে এজন্যও প্রয়োজন মোতাবেক খরচ করা হয়। কাজেই দেড়শো লোকের থাকার এবং ৬ ওয়াক্তের খাওয়া ও নাশতার জন্য এই চড়ার বাজারেও আমাদের মাত্র চারশো টাকার মতো খরচ হয়েছে। জামায়াতের সীমিত বাইতুলমালই এ সব বোঝা বহন করেছিল। কেননা চাঁদার আবেদন ছাড়াই যোগদানকারীগণ নিজেদের কর্তব্য, বুদ্ধি ও দায়িত্বানুভূতির কারণে সম্মেলন চলাকালেই যে টাকা বাইতুলমালে দাখিল করেন, তার পরিমাণ সম্মেলনের মোট খরচের চাইতে অনেক বেশী ছিল।

জামায়াতের সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের সমীপে

যারা আপনাদের কাজে আগ্রহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন অথবা একে বুঝার খায়েশ রাখেন, তাদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ এবং ঠিকই অভিযোগ করা হয়েছে যে, আমাদের সভা-সম্মেলনে আমরা তাদেরকে দর্শক (Visitor) হিসেবে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিয়েছি কেন? এ ব্যাপারে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ীর নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অবশ্য আমরা নিজেরাই এর প্রয়োজন অনুভব করছি যে, যারা আমাদের কাজকে বুঝতে চান, তারা আমাদের সভা-সম্মেলনের কার্যাবলী পরিদর্শন করতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের একটি অক্ষমতা ছিল। দারুল ইসলাম গ্রামে মাত্র কয়েকটি গৃহ ছিল এবং আশে-পাশে আর কোন গ্রামও ছিল না। কাজেই এখানে বেশী মেহমানের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ছিল।

জামায়াত তার সদস্যদের সব রকমের কষ্ট সানন্দে বরদাশত করতে পারতো। তাদের পক্ষে মজুর হয়ে কাজ করায় লজ্জা ছিল না। বিছানাপত্র নিজেদের কাঁধে করে বহন করতে তারা কষ্ট অনুভব করতেন না। ভুখা থাকাও তাদের জন্য পীড়াদায়ক ছিল না। কোনো মেজবানের খেদমতেরও তারা মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কিন্তু জামায়াতের বাইরের লোকেরা এখানে এসে কোনো প্রকার কষ্ট বরদাশত করবে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছিলাম না। আবার এ বিপত্তিগুলো শুধু দারুল ইসলামের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরং দিল্লী ও হায়দারাবাদের সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কোনো না কোনো বিপত্তির সম্মুখীন আছেন। কোথাও রেশনের আবার কোথাও অন্য কোনো কারণ। অবস্থার গতিধারা একথা প্রমাণ করে যে, সম্ভবত এ ধরনের বাধা-বিপত্তি এখনো বহুদিন পর্যন্ত আমাদের পিছু ছাড়বে না। এজন্য কিছু কালের জন্য আমরা আমাদের সমর্থকবৃন্দের নিকট অগ্রিম ও এককালীন অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

জামায়াতে ইসলামীকে
ভালভাবে জানতে হলে পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়

- ❖ পরিচিতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- ❖ জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
- ❖ জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
- ❖ বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
- ❖ ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
- ❖ মুসলমানদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

- * গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- * মেনিফেস্টো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- * সংগঠন পদ্ধতি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
- * ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই
- * অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
- * ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

- ❖ সত্যের সাক্ষ্য
- ❖ ইকামাতে দীন
- ❖ ইসলামী বিপ্লবের পথ
- ❖ বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

- • জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী ১ম ও ২য় খণ্ড
- • জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
- • মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫০৫/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯